যুক্তিতে যার ব্যাখ্যা নাই

ভূমিকা ও সম্পাদনা

তুষারকান্তি পাণ্ডে

গ্রন্থনা

৮বি, কলেজ রো,

কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
দেবর্ষি
৫২/১ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলি-৯

প্রথম প্রকাশ :, মহালয়া ১৩৬৮

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
শ্যামলী ঘোষ
শুকল্যাণী প্রেস
১৫/বি, বিনোদ সাহা লেন
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা নাই

"There are mo:e things in this heave ı and earth Haratio Than are dreamt of in your philosophy." **অর্থাৎ "বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা নাই"**

আজ হতে অর্ধ সহস্র বৎসর পূর্বে মহাকবির এলিজাবেথিয় ইংলণ্ডে যে কথা সত্য ছি। আজ আমাদের এই বিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ লগ্নের এই অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তেও সে কথা সত্য। বুদ্ধিতে সব কিছুর ব্যাখ্যা মেলে না। বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না এমন ঘটনা আজও ঘটে। অঘটনও ঘটে। অঘটন ঘটন পটিয়সী প্রকৃতির রহস্য ঘেরা এই বিপুল বিশ্বের সব কিছুই আমাদের তথাকথিত জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা ব্যাখ্যাত হয় না, হয়নি ও হবে না। অনেক ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটে যা গল্প ও কল্প কাহিনীকেও হার মানায়। তাই অনেক ঘটনা গল্প হলেও সত্যি। অনেক অঘটন সত্যি হলেও গল্পের মত মনে হয়। তাই এমনই সব লৌকিক অলৌকিক ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আমাদের এই সংকলনের আয়োজন। এই সংকলনের গল্পগুলি লৌকিক ও অলৌকিকের সীমা রেখাকে অতিক্রম করে লেখকগণের ব্যক্তি অভিজ্ঞতার আলোকে আলোকিত হয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছে। সংকলিত গল্পগুলির অধিকাংশই উল্লিখিত খ্যাতনামা লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত।

বিংশ শতাব্দীর বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার আগ্রাসন ও অগ্রগতির মুখে বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা নাই এমন বস্তু সিন্ধুসম এই বিশ্বে ক্রমহ্রাসমান প্রায় বাষ্পীভূত জল বিন্দুতে পর্যবসিত হয়েছে। জানা অজানার বিরাট সাগরের মধ্যে অজানা অচেনা বিলীয়মান কয়েকটি বিন্দু ছাড়া আর কিছু নহে। মানুষ নামক বুদ্ধিসর্বস্ব এই জীবের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পেতে পেতে অজানা সবই প্রায় আবিষ্কৃত। সাধারণতঃ কোন একটি অঘটন ঘটে গেলে তা অনেক দিন আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে মনে

নাড়া দেয়। আর এই অঘটন কেবল মাত্র সাধারণ ভাত রুটি খাওয়া মানুষের জীবনেও ঘটে এমন নয়। খ্যাত নামা লেখক সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদদের জীবনেও এমন বহু ঘটনা ঘটে যার কোন কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁরা খুঁজে পাননি। বিজ্ঞান মানব মনের গভীর গ্রহন প্রদেশের অতলান্তিক গহ্বরে প্রবেশ করেছে। তবে এতদ্‌সত্বেও মানব মন আজও রহস্যাবৃত্ত ও ‍দুর্জ্ঞেয়।

মানুষের চলার পথে কত বিচিত্র ঘটনাই না ঘটে। এর থেকে কারো রেহাই নাই। বিদ্যাসাগর থেকে হলধর কর্মকার সকলের জীবনেই এমন কিছু ঘটে, এমন কিছু ঘটেছে যার উত্তর সে আজও খুঁজে পাইনি, পাবেনা। বিদ্যাসাগর মশাই বাংলা সাহিত্যে 'অকুতোভয়তা' নামে যে অলৌকিক কাহিনী লিখেছেন তা আসলে ভৌতিক কাহিনীর নামান্তর। এই গল্পে বিদ্যাসাগর মশাই ভূত ও ভৌতিক বিশ্বাসকে ব্যঙ্গ করে কটাক্ষ করেছেন। ব্যাখ্যাতীত ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ উক্ত গল্পে লক্ষণীয়।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সত্যি সত্যি ভূত দেখেছেন। মেদিনীপুরে থাকা কালে নেগুয়াতে রাত্রে তিনি প্রেতিনী দর্শন করেন। দর্শন করা মাত্র তিনি প্রায় অচৈতন্য হয়ে পড়েন। এই প্রেতিনী দর্শনের আঘাত তিনি দীর্ঘকাল কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র যে কিছুটা খিট খিটে মেজাজের হয়ে পড়েন তাঁর পেছনে অনেকের ধারণা এই প্রেতিনী-দর্শন। তবে একটা কথা মনে হয় যে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় এক যুক্তিনিষ্ঠ মনীষী কেন ভূতে বিশ্বাসী হলেন? তিনি কি সত্যি সে রাত্রে প্রেতিনী দর্শন করেছেন? বঙ্কিমচন্দ্রের সাথে যে ভৃত্যটি ছিলেন তিনি তাঁর সাথে সে রাত্রে প্রেতিনী দেখেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নাকি সংজ্ঞাহীন হওয়ার পূর্বে প্রেতিনীকে লক্ষ্য করে গুলিও ছুঁড়ে ছিলেন।

তবে একথা ঠিক যে বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রত্যক্ষদর্শী ভৌতিক কাহিনীর প্রথম লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিগত ভাবে যে ভৌতিক অভিজ্ঞতা লাভ করেন তা নাকি তাঁকে তার বাকি জীবনে নানাভাবে প্রভাবিত ও তাড়িত করেছে। ফলে "নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী" গল্পটি অসমাপ্ত রেখে তিনি মারা যান।

বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় রবীন্দ্রনাথও পরলোক তত্ত্বে ও ভৌতিক অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভৌতিক কাহিনীতে যে ভৌতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন তা বুদ্ধিতে ব্যাখ্যাতীত হয়ে লেখকের প্রখর কল্পনা শক্তির ও সূক্ষ্ম অনুভূতির সূক্ষ্মাতীত মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া কলাপের প্রত্যক্ষ প্রভায় প্রভাবিত। তবে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভৌতিক কাহিনীগুলি লেখকের ব্যক্তিগত ভৌতিক বিশ্বাস

প্রসূত। বিভূতিভূষণ পরলোক তত্ত্ব (দেবযান) ও ভৌতিক তত্ত্বের বিশ্বাসে পূর্ণ মাত্রায় আস্থাশীল ছিলেন। তিনি তার বিস্ময় ভরা অতি বিশ্বাসী গ্রাম্য (সরল) মন দিয়ে পারিপার্শ্ব নিরীক্ষণ করেছেন। আর যখনই কোন ব্যাখ্যাতীত অস্বাভাবিক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন তখন তাকে অতিলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রকাশ হিসাবে মেনে নিয়েছেন। তাঁর ভূত ভয় দেখায় না। ভয়াল কোন পরিবেশ সৃষ্টিও করেনা। আমাদের আপনজন হিসাবে আমাদের পাশে থেকে আমাদেরকে ইহলোক ও পরলোকের অবিচ্ছেদ্য আঙ্গিনায় উপস্থাপিত করে। কোলরিজ ও ওয়ালটার ডিলা মেয়ার প্রমুখ তন্ময় কবি যে মিস্টিক দৃষ্টি ও রোমান্টিক ভঙ্গি দিয়ে অতিলৌকিক ঘটনাকে লক্ষ্য করেছেন আমাদের সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও বিভূতিভূষণঅনেকটা তাই করেছেন।

তবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ভূত বিশ্বাসী ছিলেন কিনা বোঝা যায় না তবে তার ভৌতিক তথা অলৌকিক কাহিনীগুলি তাঁর রোমান্টিক ধ্যান ও ধারণার অনুসারী হয়ে পাঠক চিত্তকে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মুগ্ধ করে।

তবে বাঙ্গলা সাহিত্যে প্রথম বৈঠকী মেজাজের ভূতের গল্প লেখেন ত্রৈলোকনাথ মুখোপাধ্যায়। তাঁর ভৌতিক গল্প প্রখর কল্পনা শক্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে এক উপভোগ্য কল্প কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছে। পূর্ব্বেই বলেছি এই গ্রন্থে যে সমস্ত ব্যাখ্যাতীত ঘটনা গল্পাকারে লেখকগণ লিপিবদ্ধ করেছেন তার অনেক গুলিই ব্যক্তিগত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উজ্জ্বল। এই একটি কারণেই প্রমথনাথ বিশীর **আয়নাতে** যেমন ব্যাখ্যাতীত ঘটনার ঘনঘটা তেমনি আশাপূর্ণা দেবীর আলৌকিক গল্পেও যে ঘটনার রোমাঞ্চকর অবতারনা তা আমাদের বুদ্ধির অতীত, জ্ঞানের অগম্য।

তান্ত্রিক সাধক তারাপ্রণব ব্রহ্মচারীর **অশরীরী** শরীরী হয়েও—দেহাতীত কোনো অজ্ঞাত লোকের দৈববাণীর বার্তাবহ। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নিয়তি পুরুষ নিয়তির অপ্রতিরোধ্য দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে নিষ্পেশিত। আর মনোজ বসুর **ওঁআত্মা** গা ছমছম রাত নিঃঝুম কোনো এক অজানা আতঙ্কের বিহ্বল প্রকাশ। শরদিন্দু বাবুর দ্বিচারিনী **মধু মালতীর** মধু মিলনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার ইশারায় কতনা পুরুষ পথ হারিয়েছে।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধায়ের **বিনোদ ডাক্তার** কতোকাল আগে ঘর চাপা পড়ে মারা গেলেও এখনো বারবার ফিরে ফিরে আসে তার ভালোবাসার ডাক্তারখানায়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের **তৃষ্ণার** অবিনাশী তৃষিত আত্মার আর্ত্ত হাঃ হাঃ কার আমাদের সম্মোহিত করে।

তু. কা. পা.



অশরীরী

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

লড়বড়ে কাঠের সিঁড়ির ধাপে পা রাখতেই হৃৎকম্প। সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল ওপরের ছোট্ট ঘরখানা। এটাও কাঠের জীর্ণ দশা। কবে বলতে কবে না মুখ থুবড়ে পড়ে মাটি নেয়।

আমার ওপরে উঠতে আর মন চাইছে না, ফিরেও যেতে ইচ্ছে করছে না। আকাশ ভরা কৌতুহল নিয়ে তাকে দেখার জন্যে এলুম, তাকে না দেখেই বা যাই কেমন করে ?

কোয়ান আমার সঙ্গী পথ-প্রদর্শক, পিশাচসিদ্ধ ওয়ামানসানের কাহিনী শোনানোর কথক। ও আমার ডান হাতের কব্জিটা ধরে বুড়ো আঙুলের চাপ দিল একটু। ফিরে তাকাতেই চোখের ইশারায় ওপরে উঠতে বলল। সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে থমকে যেতে, ও আমার মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব বুঝে নিয়েছিল।

আমি ধাপে ধাপে পা ফেলে উপরে উঠছি অতি সন্তর্পণে। পেছনে কোয়ান। চতুর্দিকে ঘন জঙ্গল। লোক বসতি চোখে পড়ে না। পাহাড় ঘেরা জায়গা। পুল পেরিয়ে নৌলাই শ্মশান। নিচে বেশ

ঝরঝর ঝরণা। সবই দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার। এ তো গেল ওদিকের কথা। এদিকে রডোড্রেনড্রন ইউক্যালিপটাস পাইন ভরতি।

ইউক্যালিপটাসের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। তার মধ্যে মাঝে মাঝে একটা উৎকট গন্ধ মিশে নাকে ঝাপটা মারছে বিচ্ছিরি রকমে। দম বন্ধ করে রাখছি, হাঁপিয়ে উঠছি। গন্ধটা নিয়ে আসছে ওপরের ঘর থেকে। একটা নিঃশ্বাস টানার আওয়াজও কানে বাজছে হিস হিস করে। ময়ালের রাজ্য, ময়ালের আস্তানা হয়েছে কিনা ওপরটা কে জানে।

যত উঠছি, তত গন্ধ বাড়ছে আরো। কিসের দেহ পচে গলে খসে পড়ার? দাঁড়িয়ে পড়ে আবার। ঘাড় ফিরিয়েছি। কোয়ানের নির্দেশে কথা কইতে বারণ। মুখে টুঁ শব্দটি করিনি, দু' চোখে জিজ্ঞেস করেছি। 'চোখের ভাসা বুঝতে ওর অসুবিধে হয়নি এতটুকু। ওর চোখে দেখেছি আগের দৃষ্টি, আগের দৃষ্টি ঠিক আগের নয়, অনেক কিছু লেখা রয়েছে এবারে। আমি যা ভাবছি, কিচ্ছু নয় কিচ্ছু নয়। সমস্ত সিঁড়ি ভেঙ্গে ঘরের দোরে পেঁছুতে বলছে নির্ভয়ে।

এই কোয়ানই একদিন ওর ঘরে ঢোকার মুখে ভয়ে আঁতকে উঠছে। কি আর্তনাদ। সারা জঙ্গলটার সর্বশরীরে কাঁপুনি জড়িয়ে ধরেছে। একটানা 'আঁ—আঁ' চিৎকার। থামতে চায় না মোটে।

কোয়ান দেখেছে, ঘরের অন্ধকারে একটা কঙ্কাল উবু হয়ে বসে। জোড়া হাঁটুর মধ্যখানে মাথাটা ঝুকে পড়েছে। কঙ্কালের রঙটা সাদাটে নয়। মিশমিশে কালো, কালো আলকাতরা মাখানো যেন। কোটরাগত চোখের তারায় ময়ালের জিভ লক্‌লক্‌ করে নাচছে।

কঙ্কাল উঠে দাঁড়ালো, এগিয়ে এলো। সজোরে ডান হাতের থাবাটা বসিয়ে দিল কোয়ানের ডান কাঁধে। মুহূর্তে কোয়ান নিস্তেজ নির্জীব হয়ে গেল।

থেমে গেল আর্তনাদ।

কঙ্কাল 'হি-হি' করে প্রেতের হাসি হেসে বলল, ওয়ামানসানের কাছে এসেছিস কি করতে?

ওয়ামানসানকে আগে কখনো দেখেনি কোয়ান। বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করছে। কেন এসেছে, কি জন্য এসেছে মুখে একটা কথাও সরলো না। একেবারে বাকরোধ যাকে বলে।

ওয়ামানসান বলল, তুই না বললেও তোর মুখ দেখে সব বুঝেছি আমি। খরচ করতে পারবি? খরচের পরিমাণটাও শুনিয়ে দিতে ছাড়েনি ওয়ামানসান। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছে কোয়ান।

পরদিন ভোর না হতেই, যা চেয়েছিল—তার দ্বিগুন টাকা এনে, ওয়ামানসানের পায়ে প্রণামী রেখেছে কোয়ান। এক একখানা নোট গুণে গুণে তুলে নিয়েছে ওয়ামানসান। হাসতে হাসতে কোয়ানের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলেছে, ফল পাবি। পেয়ে গেলেও আসা ছাড়িসনি। আর ফল পাওয়ার আগে তোকে তো আসতে হবেই। ক্রিয়াকলাপের জন্য কখন কি আটকে যায়—টাকা-পয়সার দরকার পড়ে।

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যেমন, তেমনি নিষ্ঠা—বিশ্বাস নিয়ে পালনও করে গেছে কোয়ান। কোন সময়ের জন্য ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়নি। হাতে-নাতে ফলও পেয়েছে। তুটো ছেলের পর—এক যুগ বাদে মেয়ে এলো ঘর আলো করে। খাসিয়াদের মেয়ে না হলে বিষয় রক্ষে করবে কে? ছেলে কোন কাজের নয়, মেয়েরাই তো সর্বেসর্বা। সম্পত্তির মালিক বংশ রক্ষার মালিক।

অনেক আদরের মেয়ের নামকরণ করা হল সিতিমন।

বছর পাঁচেক বয়স অবধি সিতিমন বেশ সুস্থ-সবল ছিল। বেশ হাসিখুশি। কিন্তু পাঁচ পেরোতেই বাড়িময় বিষণ্ণ বিপদের ছায়া ঘুরে বেড়াতে লাগল। সিতিমন থাকবে কি চলে যাবে এই চিন্তা সবার। অদ্ভুত ব্যামো। ডাক্তার বদ্যির অসাধ্য চিকিৎসা। কোন কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। কোয়ান তো মাথা চাপড়াচ্ছে দিনরাত। ধন্না দিচ্ছে ওয়ামানসানের দরজায়।

ঘুমুতে ঘুমুতে উঠে পড়ে সিতিমন মাঝরাতে। ঘুমন্ত অবস্থায় বেরিয়ে যেতে চায় ঘর থেকে। কার ডাক ও শোনে। শোনে কোয়ানও। ফ্যাসফেসে গলায় ডাকে—সিতিমন চলে আয়। চলে আয়!

কখনো ভয় পেয়ে সিতিমন চিৎকার করে ওঠে!—গলা টিপতে আসছে কে? কোয়ান দেখে, ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে এক কায়ামূর্তি, ছায়ার হাতজুটো বাড়াচ্ছে, বাড়াচ্ছে মেয়ের দিকে। ত্রাস ত্রাস ত্রাস। বুকের রক্ত হিম করা ত্রাস। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবার জন্য কোয়ান ওয়ামানসানের শরণাপন্ন। সিতিমন ওয়ামানসানের দান। একমাত্র ওয়ামানসানই বাঁচাতে পারে ওকে। ভয় পেয়ে পেয়ে মেয়েটা দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। তুধের শিশুর প্রাণটুকু টুক করে না ঝরে পড়ে শেষে।

যখুনি ওয়ামানসানের কাছে আরজি জানাতে এসেছে কোয়ান, যথাসাধ্য দিয়ে গেছে। সিতিমন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে। কোন ভয়ের ছবি দেখেনি ঘুমের ঘোরে বা ঘুম ভাঙার পর। এটা বেশীদিন চলেনি কিন্তু। মাত্র ক'টা দিন, আবার যে-কে সেই। আবার এসেছে কোয়ান, আবার আকুতি জানিয়েছে। আবার ওয়ামানসানের পায়ে পড়েছে, পায়ে ঢেলেছে সমস্ত টাকা নিজের জেব উজাড় করে।

ফল—উপশম পুনরাবৃত্তি উপশম পুনরাবৃত্তি। নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ল কোয়ান। এমন দিনে কাছে এসে দাঁড়াল বন্ধু নোয়েল। বলল, সে অনেকের মুখে শুনেছে ওয়ামানসানের বদনাম। ওয়ামানসান পিশাচসিদ্ধ, ও টাকারও পিশাচ। মেয়েকে বাঁচানোর জন্য, নিজে বাঁচার জন্য কোয়ানের উচিত প্রকৃত কোন সাধুসন্তের আশ্রয় নেওয়া।

কামরূপে ব্রহ্মতান্ত্রিক দিব্যনয়ন মহারাজের কাছে নোয়েল নিয়ে গেছে বাপ-মেয়েকে।

দিব্যনয়ন সব শুনে মৃত্যু হেসে বলেছেন, যজ্ঞের আগুনের দিকে চেয়ে বসে থাকতে কোয়ানকে। কি ব্যাপার ঘটছে, সমস্ত দেখতে পাবে সমস্ত জানতে পারবে। অভয় দিয়েছেন তিনি। সিতিমনকে ডানপাশে বসিয়ে মাথায় ডানহাত স্পর্শ করে থেকেছেন।

খানিক বাদে যজ্ঞের আগুনের তেজ কমেছে। কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া ওঠা-নামা করতে দেখেছে কোয়ান চোখের সামনে। ধীরস্থির দিব্যনয়ন চোখ বুজে বসে, ধ্যানে মগ্ন। সিতিমনেরও তু'চোখ বোজা। ও-ও যেন ছোট দিব্যনয়ন হয়ে গেছে বড় দিব্যনয়নের স্পর্শে।

এসব আর দেখছে না কোয়ান। দেখছে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। একটা কালো জমাট অন্ধকার ছাড়া চোখে পড়ছে না অন্য কোন দৃশ্য। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে অন্ধকারে দু'চোখ সয়ে আসতেই, যা দেখল, চমকে উঠল। শিলংয়ের দৃশ্য। মৌলাই শ্মশান মৌলাই জঙ্গল। ওয়ামানসানের ঘর। ঘরে নেই ওয়ামানসান।

জঙ্গলের মধ্যে ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় বসে। ছুরি দিয়ে নিজের করে আঙুল চিরে রক্ত বার করল। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে। বুড়ো আঙুলে রক্ত মাখিয়ে মাটিতে দুর্বোধ্য ভাষায় কি সব লিখল। তারপর তার ওপর বসে, দু-হাত বাড়িয়ে দিল কাউকে ডাকার ভঙ্গীতে। ডাকছে. সিতিমন চলে আয়, চলে আয়···। উঠে পড়ল।

একটু তফাতে ছুরি দিয়ে মাটিতে কতকগুলো আড়াআড়ি সোজাসুজি দাঁড়ি টানল। বাঁহাতের করে আঙুল চিরে, সেই ছুরির ফলার রক্ত দাগে দাগে বুলোচ্ছে। শেষ হল বুলনো। বসল দাগের ওপর—মাঝখানটায়। বিড় বিড় করে কি বলল, বোঝা গেল না। শুধু শোনা গেল—'ফোরসয়, ফোরসয় বলে ডাকছে কাকে। বলছে, তোমার দু'হাত—সিতিমনের গলার দিকে···।

ফোরসয় নামটা শোনা কোয়ানের। ওয়ামানসানের গৃহভৃত্য। মারা যাবার পর পুঁতে রেখেছে ওখানে দাহ না করে। লোকে বলে ওই জায়গায় বসে নাকি পিশাচ-সাধনা করে ওয়ামানসান। লোকের কথা কেন নিজে চোখে দেখতে পাচ্ছে তো এখন কোয়ান।

ওই মাটি ফুঁড়ে একটা ছায়া উঠল ছায়ার দু'হাত ওয়ামানসানের গলার দিকে এগুচ্ছে। ওয়ামানসান কাছে, আমার দিকে নয়, সিতিমনের দিকে······। ছায়ার ফোরসয় কোন কথা গ্রাহ্য করছে না। ওয়ামানসানের ওপরেই লক্ষ্য।

এপাশের মাটি ফুঁড়ে উঠে বসল যে মেয়েটি, সে হারিয়ে গেছল। জীবিত অবস্থায় নয় মৃত অবস্থায়। ও তো কোয়ানের প্রতিবেশীর মেয়ে। যেদিন ওর প্রাণহীন দেহটা মৌলাই শ্মশানে নিয়ে আসা হল—কি ঝড়বৃষ্টি। একটু আশ্রয়ের জন্য লোকে এদিক-ওদিক সরেছে, এর

মধ্যেই দেহটা অদৃশ্য। খুঁজে পাওয়া যায় নি। বৃষ্টি থামতে সকলে এসে তাজ্জব।

এখন দেখা যাচ্ছে, মেয়েটির দেহ চুরি করে এনে পুঁতে রেখেছে ওয়ামানসান ওখানে। রাতের অন্ধকারে সাধনা করে। ওকে ডাকলে, সিতিমন চলে যায়। ওই-ই তাহলে সিতিমন। ও তাদের মেয়ে হয়ে এসেছে ওয়ামানসানের আদেশে।

দেখছে কোয়ান, যে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়েছে মেয়েটি, সেই মাটি ফুঁড়ে ভেতরে চলে গেল যেন। কিন্তু আশ্চর্য, ফোরসয়ের ছায়াটা গেল না। ওয়ামানসানকে জড়িয়ে ধরেছে। ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করছে ওয়ামানসান।

দিব্যনয়ন মহারাজের ডাকে চোখের ঘোর কাটল কোয়ানের। স্বাভাবিক হয়ে উঠল আবার। আগের মানুষে ফিরে এলো। দেখল, সিতিমন তার দিকে চেয়ে। মিষ্টি হাসি চোখে—ঠোঁটে। দিব্যনয়ন মহারাজ ও হাসছেন। বললেন, যা ব্যবস্থা করার করেছি। তোরা আর দেখবি নে বিভীষিকা, দেখবি নে ছায়া মূর্তি। তোদের বদলে দেখবে-যে দেখাচ্ছিল এতদিন।

'দেখুন' কথাটা কানে যেতে সচেতন হয়ে উঠলুম আমি। কোয়ান কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলছে। ওয়ামানসানের ঘটনা ভাবতে ভাবতে এসে গেছি আমি একেবারে দরজার গোড়ায়—চৌকাঠের এপারে।

ঘরখানা শতছিদ্র, আলো—আঁধারি। উঁকি মেরে দেখছি, ওয়ামানসানকে দেখতে পাচ্ছি না। দেখছি, দুটো কঙ্কাল পাশাপাশি শুয়ে। বাঁদিকের কঙ্কালের হাত ডানদিকের কঙ্কালের গলায়।

চমকে উঠলুম। ডানদিকের কঙ্কালের বুকের কাছটা ধুক ধুক করছে। কোয়ান আঙুলের ইশারায় দেখিয়ে দিল। ওয়ামানসান। চোখ বড় বড় করে দেখছি আমি। চামড়া ঢাকা কঙ্কালই একটা। এখনো প্রাণ আছে। ক্ষীণ নিশ্বাসের আওয়াজে বিড় বিড় করে কি সব বলছে। বলছে, তুই আমাকে ছাড়, আর পারছি না……।

পাশের কঙ্কালের হাতটা খসে পড়ছে ওয়ামানসানের গলা থেকে।

ওয়ামানসান নিজেই টেনে নিয়ে গলার কাছে রেখে, নিজেই বলছে, গলা ছাড়, আর পারছি না আমাকে বাঁচতে দে রে !

ও কঙ্কালটার পরিচয় জানি আমি। কোয়ানাই জানিয়েছে ফোরসয়ের। দিব্যনয়নের অভয়—আশীর্বাদ বাপ—মেয়ে মাথায় নিয়ে ফেরার পর কোয়ান কৌতূহলী মনে এসেছে এখানে। দেখেছে, ফোরসয়ের সমাধির গর্ত। ফোরসয়ের কঙ্কাল তুলে এনেছে ওয়ামানসান। কাউকে কিছু শোনানোর জন্য বলছে না, সেদিকে তার দৃষ্টি নেই, কোন খেয়াল নেই। কে আসছে না আসছে, কে শুনছে। কঙ্কালটাকে জড়িয়ে ধরে নিজের মনেই বলে চলেছে, আমাকে এমন করে চেপে ধরছিস কেন ? দম বন্ধ হয়ে আসছে যে। বড় কষ্ট।

আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার হাত ধরে কোয়ান টেনে নিয়ে এলো সিঁড়ির কাছে। নামছি আমি।

শুনছি ওয়ামানসানের নিশ্বাসের কথা।—দম বন্ধ—বড় কষ্ট··· গলা ছাড়···।



অলৌকিক

আশাপূর্ণা দেবী

'মায়ের প্রথম বলি হচ্ছে রাস্তার সেই ঘেয়ো কুকুরটা। যেটা অনবরতই অসীমাদের বাড়ির দরজার গোড়ায় তার ঘৃণ্য দেহটা নিয়ে শুয়ে পড়ে থাকতো, আর হাঁফাতো।

হ্যাঁ সেইটাই প্রথম বলি।

তবে তার জন্যে তো আর হাড়িকাঠের ব্যবস্থা করা হয়নি, ব্যবস্থা করে দিল একটা দুর্দ্দান্ত দোতলা বাস। প্রয়োজনের চেয়ে আয়োজনটা একটু বেশীই হয়েছিল। শুধুতো ধড়মুণ্ডু আলাদা নয়, একেবারে পেষাই হয়ে গিয়েছিল কুকুরটা।

তবু সে ঘটনাটাকে তেমন করে আমল দেয়নি অসীমা. 'নেহাতই কাকতালীয়' বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল। শুধু কুকুরটার সেই পেষাই হয়ে যাওয়া বীভৎস চেহারাটা তার মনের মধ্যে একটা ঘায়ের মত দগদগ করেছিল বেশ কয়েকদিন। বিভাস প্রশ্ন করেছিল 'হঠাৎ কি

হল তোমার ?' খুকু বলেছিল 'মা তুমি সারাক্ষণ বুবুর মা'র মতন হাঁড়ি মুখ করে আছ কেন ?' অসীমা হেসে উত্তর দিতে পারেনি। ফিকে একট হাসির মত করে বলেছিল 'কই আবার ?'

তার বেশী আর কিছু নয়। সেই তো প্রথম।

তখনও নিজেকে ভয়ানক একটা অলৌকিক শক্তির অধিকারিণী বলে টের পায়নি অসীমা।

দ্বিতীয়টা ঘটলো—

কিন্তু তার আগে আগের ইতিহাসটা বলে নিলেই বোধহয় ভাল হয়। ব্যাপারটা ঘটেছিল নিতান্তই আকস্মিক। পুরনো মডেলের ছোট গাড়িখানা বাতিল করে বিভাস যখন নতুন বড় গাড়িটা কিনল, অসীমা ধরে বসল, 'চলো একদিন যেখানে হোক বেড়িয়ে আসি।'

'যেখানে হোক ? কোথায় ?'

'যেখানে দু'চক্ষু যায়।'

'আইডিয়াটা—মন্দ নয়। তারপর ?'

'তারপর—আবার কি ? সন্ধ্যায় গৃহে প্রত্যাবর্তন, ভূরি ভোজন, আরামে শয়ন—'

'যাক বাঁচা গেল। পুরোপুরি বৈরাগ্য নয় তাহলে। কিন্তু তোমার আদরের দাদার বাড়ি যেতে না চেয়ে'

'নাঃ দাদার বাড়ি যেতে আর ইচ্ছে করে না। এই বেশ খাবার টাবার সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ব, কোথাও নেমে পড়ে গাছতলায় বসে খাব। সন্ধ্যায় ফেরার মাথায় রেখে যতটা যেতে পারা যায় যাব—'

বিভাস হেসে বলে, 'শুনে ভালই লাগছে। প্রাক্-বিবাহ যুগের স্মৃতিটা মনের মধ্যে ভেসে উঠছে। কিন্তু হাতে যে গোটাকতক ঝুলে থাকা রুগী রয়েছে—'

'থাক'। অসীমা রেগে উঠেছিল, 'ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে তারা আর তোমার নামে কালি লেপে নিজেরা ফর্সা হয়ে যাবে না।'

তারপর সত্যিই পরদিন 'যেদিকে দু'চক্ষু যাওয়া'র পথে বেরিয়ে পড়ল

ওরা খুকুকে নিয়ে। যত পারল খাবার নিল, জল নিল, ডাব নিল, মোটকথা বৈরাগ্যের লক্ষণ কিছু প্রকাশ পেল না এই যাত্রায়।

খুকু তো তার প্রিয় পুতুলটাকে পর্যন্ত নিল।

ডুগডুগির আওয়াজটা প্রথম কানে এসেছিল খুকুরই। আর যেই শোনা সেই আবদার।

'বাবা ভালুক নাচ দেখবো।'

'ভালুক নাচ? সে আবার কোথা?'

'ওই যে শব্দ আসছে। ···ও বাবা—'

অতএব শব্দ অনুসরণ করে এগোতে হ'ল। আর একটু এগোতেই মেলার প্যাণ্ডেলটা নজরে পড়ল। শুধু ভালুক নাচ নয়, বহুবিধ নাচ চলছে সেখানে। গাড়ী থেকে মুখ বাড়ালো বিভাস।

'কিসের মেলা বসেছে হে?'

'আজ্ঞে কঙ্কালেশ্বরীর বাচ্ছিক মেলা।'

'কঙ্কালেশ্বরী! সবনাশ! শুনছো খুকু, এখানে নেমে কাজ নেই। এ সব ডাকিনী-যোগিনী ভূত প্রেতের আড্ডা।'

'না আ আ! মেলা দেখবো!'

'এই শুনছো, তোমার মেয়েকে সামলাও।'

'কে কাকে সামলায়?' অসীমা খুসি খুসি মুখে বলে, 'কোনও কালে গ্রামের মেলা দেখিনি, ছাড়বো ভেবেছ? আজকের নিরুদ্দেশ যাত্রায় এটাই হলো পরম লাভ।'

মেলাতলায় ঢুকে পড়ে, খুকুর আর খুকুর মায়ের মধ্যে আবেগ আনন্দ উত্তেজনার তারতম্য দেখা গেল না বিশেষ। বরং খুকুর খেলনা খুকু যত কিনল, অসীমার খেলনা কেনা হল তার চেয়ে বেশী। বিভাসের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বাধাপ্রদান কোনটাকেই গ্রাহ্য করলনা অসীমা।

'তোমার সংসারে যে এত জিনিষের অভাব ছিল, আর ঘর সাজাবার যে কিছুই ছিল না, তা তো জানতাম না—' বিভাস হাসে, 'জানলে—কোথায় কখন মেলা বসেছে তার খোঁজ নিতাম। বাংলাদেশে আর যত যার অভাব থাক, মেলার অভাব নেই।'

'আহা খোঁজ করা জিনিসে মজা কোথায় ? এ আচমকা পেয়ে গেলাম বলেই না--' অসীমা জিনিসভর্তি নতুন কেনা ঝুড়িটা ঠেলে ঠেলে গাড়ীতে ঢোকাতে ঢোকাতে বলে, 'তুমি তো সবতাতেই হাসো। দেখবে—আমাদেব সওদা যে দেখবে, ভাল বলবে। এই সব গ্রামের '

কথাটা শেষ হল না অসীমার। শেষ করা হলনা।

পিছনে বেজে উঠল শাঁখের আওয়াজের মত তীব্র একটা আওয়াজ।

মেলার বাজারে তো খুব পয়সা ছড়ালি, মাকে দর্শন করে গেলি না ?'

অসীমা চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখল কপালে সিঁদুরলেপা রক্তাম্বর-ধারী সেই কালো শুটকো লোকটা। যে লোকটা সমানে কাছাকাছি ঘুরছিল, আর অসীমা যাকে নেহাতই কাপালিক-সাজা গ্রাম্য গাঁজাখোর ভেবে লক্ষ্য মাত্র করছিল না।

এখন কিন্তু ওর ওই শাঁখের মত গলার তীব্র প্রশ্নটায় বুকটা কেমন কেঁপে উঠল অসীমার। থতমত খেয়ে বলল 'দর্শন ?'

হ্যাঁ। মা কঙ্কালেশ্বরীকে দর্শন করেছিস ?'

অসীমা ভয়ে ভয়ে বলে মন্দিরটা কোন্ দিকে ?

'থাক—' বিভাস গাড়ীতে ষ্টার্ট দেবার উদ্যোগ করতে করতে বিরক্ত-ভাবে বলে 'এখন আর মন্দির কোনদিকে জানতে হবে না। ওটো তু চার আনা পয়সা ফেলে দিয়ে উঠে এসো গাড়ীতে। যত্তোসব—'

মেয়েদের ভয় দেখিয়ে যারা পয়সা রোজগার করে, লোকটা যে তাদেরই একজন এবিষয়ে সন্দেহ থাকেনা বিভাসের। বিশ্বাস নেই—হয়তো অসীমা এখুনি ওর পিছু পিছু দেবী দর্শনে ছুটবে। লোকটার যেমনি কদাকার চেহারা, তেমনি চোয়াড়ে কথা। এঁরাই আমাদের দেশের—ভগবানের দ্বারোয়ান। ভাবল বিভাস, এঁদের কাছেই স্বর্গের পাশপোর্ট। নিকুচি ক'রেছে। এখন পালাতে পারলে হয়।

কিন্তু গাড়ীটা স্টার্ট নিচ্ছেনা কেন !

বিভাস নেমে পড়ে গাড়ীর গায়ে বড় একটা ধাক্কা মেরে বলে ওঠে, 'সরে পড়না বাবা ! দেখছনা দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ ধর্মপ্রাণ

ব্যক্তি আমি নই। ভিক্ষে চাইবে সোজাসুজি চাও, ঠাকুরদেবতার নাম করে কেন?'

'কী বললি ভিক্ষে!' লোকটা আর একবার তার গলার শাঁখে ফু দেয়; 'একখানা গাড়ীর মালিক হয়ে ধরাকে সরা দেখছিস যে? তোর মতন অমন কত গাড়ী এসে গড়াগড়ি খায় বুঝলি? মিনিষ্টাররা আসে, ম্যাজিষ্ট্রেটরা আসে, কোটিপতি শেঠিয়ারা আসে, তোর দেখছি বড় গুমোর! থু থু!'

ধুলোর ওপর খানিকটা থুথু ছিটিয়ে লম্বা ঠ্যাং ফেলে চলে যায় লোকটা।

'ভিক্ষে টিক্ষে বলার তোমার দরকার কি ছিল বাবু?' অসীমা অসন্তোষ প্রকাশ করে।

'ঠিক আছে। মিনিষ্টার দেখিয়ে ভয় খাওয়াতে এসেছে। যতোসব--'

কিন্তু বেশী কথা বলবার জুৎ হয় না আর। গাড়ীটা বড় জ্বালাতন করছে।

স্টার্ট আর নিচ্ছে না।

অনড় অচল দারুভূতো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে।

'কী হলো? নতুন গাড়ীর কী হলো তোমার?'

'দেখতেই তো পাচ্ছ।'

হঠাৎ অচল হয়ে যাওয়া গাড়ীকে সচল করবার যত রকম কৌশল জানা আছে বিভাসের, কাজে লাগায় সমস্ত। কিন্তু কাজ হয় না।

গাড়ীটা যেন কী এক গোঁ নিয়ে বসে আছে। যেন পূর্বজন্মের শত্রুতা সাধছে বিভাসের সঙ্গে।

খুকু ওদিকে অস্থির হচ্ছে, 'ও বাবা চালিয়ে দাওনা গাড়ীটা। বসে থাকতে ভাল লাগছে না।'

বিভাস কখনো যা না করে, তাই করে বসে। খুকুকে একটা ধমক দিয়ে বলে, 'হচ্ছে! সব সময় আবদার!'

অচল গাড়ী দেখে এদিক ওদিক থেকে ছেলে জুটেছে বেশ কতকগুলো। তাদের পয়সার লোভ দেখিয়ে গাড়ী ঠেলাতে চেষ্টা করে বিভাস, সুবিধে হয় না।

শীতের দিনে কপালের ঘাম মোছে বিভাস।

অসীমা চুপ করেই ছিল। শেষ পর্যন্ত আর না বলে থাকতে পারে না। বলেই ফেলে। 'দেখ', শুনছে, চল না ওর ঠাকুর দর্শন করেই আসি।'

কেন? বিভাস বিরক্তির হাসি হেসে বলে, 'তোমার ঠাকুর আমার গাড়ীর চাকা চেপে ধরে বসে আছেন প্রণামের আশায়?'

'আহা তা কেন! এতক্ষণই যখন এখানে আটকে থাকতে হলো একবার দেখে আসতে দোষ কি? চল না।'

'না। অন্ প্রিন্সিপল্ যাব না আমি। ওই গেঁজেল লোকটা দেখছি তোমাকে ভয় ধরিয়ে দিয়ে গেছে। ভয় ধরানোই ব্যবসা ওদের।'

'বাঃ, ওর সঙ্গে কি? ঠাকুর দেখব বৈ তো না সাধ্য, দেখাই তো উচিত ছিল। এসেছি যখন—'

'তোমার উচিতের সঙ্গে আমার উচিত-বোধ মিলছে না—' বলে গাড়ীর গায়ে আবার প্রকাণ্ড একটা থাবড়া মারে বিভাস। কিন্তু তাতে তার কিছুই বৈলক্ষণ্য ঘটে না। যেমন অনড় তেমনিই থাকে।

অসীমা যেন এই গাড়ীর অনড়তার মধ্যে কোনও এক রহস্যময় ইঙ্গিত পায়। ওর মন বলে, দেবীদর্শন না করা পর্যন্ত গাড়ী চলবে না। অথচ বিভাস এখন ক্ষুব্ধ, বিরক্ত, বিপন্ন জোর করাও শক্ত।

তাই ফিকে হাসি হেসে বলে, 'মা কালী বলছেন তোদের না দেখে শান্তি পাচ্ছিনা আমি—'

বিভাস জ্বলন্তস্বরে বলে 'তোদের' নয়, বল 'তোর'। 'তোমার ইচ্ছে হয় যেতে পারো, আমাকে কাটলেও যাব না অন প্রিন্সিপল না।'

'ঠিক আছে। আয় খুকু।'

'না না, খুকুর আর এই রোদে নামতে হবে না। তোমার ইচ্ছে হচ্ছে তুমি যাও। আর পার তো তোমাদের সেই মঙ্গলচণ্ডীর গল্পের মত, প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীটার স্টার্ট করিয়ে দাও। মঙ্গলচণ্ডীর সেই ডোবা ডিঙি ভেসে উঠেছিল নাকি—'

কিন্তু এত কথা দাঁড়িয়ে শোনবার ধৈর্য্য নেই অসীমার, ও এগিয়ে গেছে।

মন্দিরের চাতালেই বসেছিল লোকটা। উবু হয়ে বসে বিড়ি খাচ্ছিল। অসীমাকে দেখে দাঁত বার করে হেসে বলে ওঠে, 'আসতে হলতো ?'

অসীমা অস্ফুটে কি একটু বলে।

লোকটা তেমনি বিকশিত দন্তে পাশের একটা লোককে বলে. 'বাবুরা সব পয়সার অহঙ্কারে মাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন, বুঝলে ? আর 'কারে' পড়লেই—কী দর্শন করবি মাকে ?'

'হ্যাঁ।'

লোলরসনা করালবদনা দেবী মূর্তি, প্রায়ান্ধকার মন্দিরের মধ্যে যেন একটা ভয়াবহতা নিয়ে বিরাজ করছেন। অসীমা আড়ষ্ট হয়ে একটা দশ টাকার নোট নামিয়ে রাখে।

দশ টাকা !

লোকটা হৃষ্টচিত্তে বলে, 'এই নে, এই মায়ের নির্মাল্য। প্রসাদী বেলপাতা। নিয়ে গিয়ে কৌটোয় রেখে দিবি। এ জিনিষ কাছে থাকলে যা সংকল্প করবি, তাই সাধন হবে। যা মন করবি তাই হবে। অবিশ্বাস করেছিস কি মরেছিস। যাঃ।'

আস্তে হাতটা পাতে অসীমা।

তারপর ফিরে আসে দ্রুতপদে। আসতে আসতে ভেবেছিল, বিভাস যেমন ঠাট্টা করল. তেমনি যদি ফিরে গিয়ে দেখি গাড়ীটা স্টার্ট নিয়েছে বেশ হয়।

ভেবেছিল, কিন্তু সত্যিই আশা করেছিল কি ?

করেনি।

করলে গাড়ীর গর্জনে বুকটা অমন কেঁপে উঠত না তার। দাঁড়িয়ে পড়ত না অমন স্তব্ধ হয়ে।

হ্যাঁ, ঘুমন্ত বাঘ জেগে ওঠার মত, ঘুমন্ত গাড়ীখানাও জেগে উঠে গর্জন করছিল তখন।

'একেবারে অব্যর্থ ফলপ্রদ স্বপ্নাদিষ্ট মাছলি।' তিক্ত হাসি হেসে স্টিয়ারিঙে হাত দিয়ে বিভাস বলে, হাতে হাতে ফল লাভ কি বল ?'

অসীমা ওর ওই পরাজিত-পরাজিত মুখটার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকে. জিগ্যেস করে না হঠাৎ কি করে অচল যন্ত্রটা সচল হলো ? বললনা, 'এখুনি ফিরছ যে ? আর বেড়ানো হবে না তা হলে ?'

অদ্ভুত একটা আতঙ্কময় অনুভূতি যেন তার বুদ্ধিবৃত্তি চিন্তাশক্তি, তীক্ষ্ণতা, তীব্রতা সব কিছুকে অসাড় করে দিচ্ছে।

সেই সেদিন দেবীর প্রতিষ্ঠা।

অসীমার অবচেতনে।

তার পরদিনই বলি নিলেন দেবী।

প্রথম বলি।

সাবধানে যেই প্রসাদী বেলপাতা মুঠোয় নিয়ে গাড়ী থেকে নামছিল অসীমা, একেবারে পায়ের ওপর এসে পড়ল ঘেয়ো কুকুরটা। যেটা অসীমার একান্ত বিরক্তি উৎপাদন ক'রে ওর দরজার কাছে পড়ে থাকে আর হাঁফায়।

অসীমা অনুভব করল তার পায়ের পাতাটা ভিজে ভিজে।

অসীমা তাকিয়ে দেখল কুকুরটার জিভ দিয়ে লালা ঝরছে। কী কুৎসিত! কী অশুচি!

অসীমার হাতে দেবীর নির্মাল্য আর ওটা কি না—অসীমা হঠাৎ ভাবল এত লোক গাড়ী চাপা পড়ে, আর এই হতভাগা ঘেয়ো কুকুরটা গাড়ী চাপা পড়ে মরে না ?

বাড়ীতে ঢুকে প্রসাদী বেলপাতা একটা আলমারীর মাথায় তুলে রেখে, সাবান মেখে স্নান করতে গেল অসীমা। বিভাস বলল, 'তোমার এই খেলনার ঝুড়ি ?

'রাখো কোনখানে।'

সহসা যেন অনেকখানি বয়েস বেড়ে গেছে অসীমার। তাই খেলনা বস্তুটা নেহাৎই খেলনা হয়ে গেল তার কাছে।

পরদিনই ঘটল ঘটনাটা।

ভয়ানক একটা হৈ হৈ উঠল একেবারে বাড়ীর সামনে। ছুটে জানালায় এসে দাঁড়াল অসীমা। কিন্তু পরক্ষণেই থেমে গেল কলরব। ভীড় সরে গেল।

মানুষ নয় কুকুর! একেবারে রাস্তার কুকুর!

ওর পক্ষ নিয়ে গাড়ীটাকে ইঁটিয়ে ভাঙা যায় না, ড্রাইভারকে মেরে তক্তা বানানো যায় না। তবে আর কিসের তামাসা দাঁড়িয়ে দেখবে লোকে?

শুধু অসীমা জানালায় দাঁড়িয়ে রইল তক্তা হয়ে। কুকুরটার মাংসের দলার মত দেহটা পড়ে রইল তার সামনে রাস্তার ওপর। হয়তো ওর ওপর দিয়ে আরও অনেক গাড়ী যাবে। কাল সকালের আগে তো আর কর্পোরেশনের ময়লা ফেলা গাড়ী আসবে না!

তবু মনকে তত বিচলিত হতে দেয়নি অসীমা। কাকতালীয় বলেই মেনে নিয়েছিল ওটাকে। আস্তে আস্তে ভুলেই যাচ্ছিল।

এই সময় আবার বোধ করি ক্ষুধা জাগল দেবীর।

আর একটা বলি প'ড়ল।

দ্বিতীয় বলি বিভাসের। সেই আদি অনন্তকালের রোগীণী মল্লিক-গিন্নী। প্রথম পাশ করে বেরিয়ে পর্যন্ত মল্লিক-গিন্নীকে দেখছে বিভাস। তার আগে তাঁকে আর কে দেখত বিভাসের জানা নেই। তবে পঁয়তাল্লিশ বছর যাবৎ নাকি তিনি হার্টের অসুখে ভুগছেন। বছর পঁচাশী বয়েস কিন্তু ছেলের বৌ-রা বলে একশোর কাছাকাছি।

বড়লোকের গিন্নী ছিলেন, এখন বড়লোকের মা। আজীবন স্বামীকে ভুগিয়েছেন, এখন ছেলেদের ভোগাচ্ছেন, হপ্তায়ে পাঁচদিন 'যায় যায়' হন, আর ডাকের ওপর ডাক আসে বাড়ীর ডাক্তারের দিন নেই রাত নেই।

ওঁর হার্ট যে কোনদিন ফেল করবে এ আশা বাড়ীর লোকের মন থেকে মুছে গেছে, নাতবৌরা নাম দিয়েছে 'অমরলতা'। আর অসীমা বিভাসকে বলে, 'তোমার কামধেনু'।

কিন্তু সে রাত্রে হঠাৎ ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল অসীমার। একটা রোগীকে

নিয়ে অনেক লড়ালড়ি ক'রে রাত এগারোটায় ফিরে সবে নেয়ে খেয়ে, শুয়েছে বিভাস, টেলিফোন ক্রীং ক্রীং করে উঠল।

'কে?'

'ডাক্তার কাকা, আমি অরুণ বলছি—ঠাকুমার—আবার বাড়াবাড়ি হয়েছে, কি রকম যেন করছেন।'

'ওই ওষুধটা দিয়েছ?'

'দিয়েছি, কিছু হচ্ছে না। খালি আপনাকে খুঁজছেন।'

'নাঃ ঘুমোতে আর দিলে না।' উঠে পড়ল বিভাস।

আর অসীমা হঠাৎ বলে উঠল 'আঃ আর তো পারা যায় না। আজ রাতই যেন বুড়ির শেষ রাত হয়।'

কিন্তু এ প্রার্থনা কি অসীমা একাই করেছিল? মল্লিক বাড়ীর সেই বিরাট গুষ্ঠীর সব্বাই করেনি? সপ্তাহের মধ্যে দুটো দিন যারা রাতে ঘুমোতে পায় কি পায় না, মাসের মধ্যে দশদিন যাদের গীতা গঙ্গাজল আর তুলসীগাছ মজুত রাখতে হয় হাতের কাছে, আর আবার সরিয়ে রাখতে হয় হতাশ হয়ে।

করেছিল বৈকি। সবাই করেছিল। 'ভগবান ওকে নাও।' মল্লিক-গিন্নীর নাতি-নাতনীর ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত যে, যখন তখন ওর কাছে গিয়েই বল্‌তো, 'বুড়ি তুমি মরবে কবে? কবে ভোজ খাবো আমরা?'

একটা মানুষ একশোবার মরমর হচ্ছে, অথচ মরছে না, এর থেকে অসহ্য আর কি আছে?

প্রার্থনা করেছিল সবাই।

কিন্তু সে খবর অসীমার জানা নেই।

অসীমা শুধু এই উপলক্ষে নিজের ওই হঠাৎ পাওয়া অলৌকিক শক্তির খবরটা জানলো।

বাক্‌সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে অসীমা। সে যা কিছু বলে তাই ফলে যায়। বিশেষণটা বিভাসই দিয়েছিল। শেষরাত্রে মল্লিক বাড়া থেকে ফিরে এসেই বলেছিল 'তোমাকে এবার থেকে বাক্‌সিদ্ধ বলা চলবে।'

তবু কুকুরটার কথা জানতোনা বিভাস। শুধু বুড়ির কথাতেই

বলেছিল। কিন্তু অসীমার মনে আবার নতুন করে কুকুরটা এসে জায়গা নিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক একটা ভয়ে হৃৎপিণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার।

ছুঁচোটো জীবহত্যা করেছে অসীমা।

মানুষ আর পশু ছুঁচু টা প্রাণী যেন তাদের মৃত্যুনীল চোখে অভিযোগের দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে অসীমার দিকে। ঘা দিচ্ছে তার গভীর চৈতন্যের স্তরে। তাদের সেই নীরব দৃষ্টি বলছে 'তুমি, তুমিই দায়ী! আমাদের খুন করেছ তুমি!'

অসীমা কি ওই প্রসাদী বেলপাতাটা ফেলে দেবে? বলবে 'হে কঙ্কালেশ্বরী তুমি আমায় মার্জনা করো।'

ফেলে দিতেই গেল একদিন; কিন্তু গুটিয়ে এল হাত। শুধু খুনী হয়েই থাকবে অসীমা?

শুধু হত্যার দায়ে দায়ী জীবন দিতে পারবে না কাউকে? পারবে, পারবে, পারবে বৈ কি। আসুক সে সুযোগ।

ফেলে দিল না।

বরং আরও যত্ন করে তুলে রাখল।

বিভাস বলে, 'তোমার কি হয়েছে বলতো?'

'কই? কি হবে?'

'মনে হয় তুমি যেন আর এক জগতে বাস করছো। এই নরলোকের কথাবার্তা দিয়ে ধরা-ছোঁওয়া যাচ্ছেনা তোমাকে। সেদিন একা বসেছিলে, মনে হচ্ছিল কার সঙ্গে যেন কথা বলছো।'

অসীমা চেষ্টা করে বলে, 'যতো সব বাজে কথা। আমাকে রাগাতে ইচ্ছে বুঝি?'

'রাগাতেই পাচ্ছে কোথায় তোমায়? বলি সেদিন যে অত সব পুতুল, খেলনা, পাখী পক্ষী, হরিণ, ঘোড়া নিয়ে এলে, কই ঘরে সাজালে কই?'

'দূর, ও কি আর সত্যি সাজাবো বলে এনেছিলাম? খুকুটা বায়না করলো তাই—'

কিন্তু খুকু কি আর বায়না করতে পারছে মার কাছে? মার সামনে যেন একটা পাথরের পাঁচীল উঠে গেছে।

এরপর আবার যখন অসীমা একটু সহজ হয়ে আসছে, সেই পাথরের প্রাচারটাকে মাঝে মাঝে আর পাথরের লাগছে না, তখন হঠাৎ তৃতীয় বলির ব্যবস্থা হলো।

রক্ত পিপাসু কঙ্কালেশ্বরা বোধ করি আবার ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছেন। অন্তুতঃ তাই মনে হল অসীমার। নইলে বাকসিদ্ধ অসীমার মুখ দিয়ে অমন কথাটা বেরোল কেন? কই আগে তো কখনো বেরোত না?

না কি চিরদিনই বেরোতো? শুধু তখন অসীমার হাতের মুঠোয় ওই অলৌকিক শক্তিটা এসে ধরা দেয়নি বলেই—

আগের কথা মনে নেই অসীমার। এদিনের কথাটাই মনে আছে। সামনের বাড়ীর ওই ছেলেটা ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে যখন ছাদের আলশেয় উঠে দাঁড়িয়েছিল তখন নিজের থেকে হাঁ হাঁ করে চেঁচিয়ে উঠেছিল অসীমা — মরবে মরবে, হতভাগা ছেলে এখুনি মরবে।'

কথাটা শেষ হয়েছিল কি না মনে নেই অসীমার। বিভাস বলে সেই ভয়াবহ দৃশ্যটা—চোখের ওপর দেখে এত বেশী আপসেট হয়ে গিয়েছিল অসীমা, পুরো দু'দিন অজ্ঞান হয়ে থেকেছিল।

জ্ঞান যখন ফিরেছে, অথচ মনের ভাব চাপার শক্তিটা ফেরেনি, তখন কথাটা বলে ফেলল অসীমা। বলল তিন তিনটে মৃত্যুর ভার সে আর বইতে পারছে না।

'তুমি কি পাগল?' বিভাস বলেছিল, এ সব তো—স্বাভাবিক ঘটনা, অহরহই ঘটছে পৃথিবীতে, নিজেকে তার কারণ স্বরূপ ভাবতে যাচ্ছ কেন?'

অসীমা এই অবোধের দিকে তাকিয়ে একটু করুণার হাসি হেসেছিল। সে কি নিজে অনুভব করছে না, কী এক অদৃশ্য শক্তির লীলা চলছে তার মধ্যে অথচ ভয়ানক একটা ভয়ের জাল যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাকে। কথা বলতে ভয় হচ্ছে তার, কারুর দিকে তাকাতে

ভয় করছে। সমস্ত পৃথিবী যেন অসীমার দিকে আঙুল তুলে শাসাচ্ছে 'এক দুই তিন। তিন তিন জনকে মেরেছিস তুই।'……

বিভাস ঈষৎ ভয় পেল।

সে ডাক্তার। অসীমার এই উৎকট ভুল ধারণার চেহারাটা ভাল ঠেকল না তার। বলল 'বেশ তো সেই শুকনো বেলপাতার গুঁড়োটুকু যদি এতই শক্তিশালী হয়, ফেলে দাও না দূর করে। অনিষ্টকারী জিনিস রেখে লাভ কি? ফেলে দিও, ফেলে দিও।'

কিন্তু অসীমা তো পাগল নয় যে মুঠোয় পাওয়া শক্তির উৎসকে ফেলে দেবে?

কী লাভ, সেকথা বিভাস কি বুঝবে? ও যে শুধুই অনিষ্টকারী নয়, পরম ইষ্টকারীও, সেটার প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি কোথায় অসীমার? 'প্রমাণ চাই, প্রমাণ চাই। দেখাতে চাই শক্তির লীলা।…জীবন শুধু নিইনা, জীবন দিতেও পারি।'

আশ্চর্য! কারুর কোনো অসুখ করছে না কেন? খুব ভয়ানক মারাত্মক অসুখ। ডাক্তারে হাল ছেড়ে দেওয়া কঠিন ব্যাধি। আগে আগে কত ভুগতো খুকুটা, কত শক্ত অসুখ গেছে বিভাসের। অথচ—

খুকুটাকে কি খুব ঠাণ্ডা লাগাবে অসীমা? পচা মাছ আর পচা দুধ খেতে দেবে? ছাতে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখবে সিঁড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়ে?

তা' অদ্ভুত চমৎকার ভাগ্য বলতে হবে অসীমার, ওসব কিছুই করতে হ'ল না অসীমাকে। কালবৈশাখীর তচ্‌নচ্‌ করা অসুখ এসে আক্রমণ করে বসলো খুকুকে।

ডাক্তারের বাড়ী।

ডাক্তারে ভরে গেল।

বিভাস মাথায় হাত দিয়ে বলল, 'ভগবান তুমি কি নেই?'

অসীমা একটুখানি পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বলল, ভগবান, তুমি আছ।'

[illegible] একটি ইঁদুরের ওয়াস্তা।

শুধু সে ইচ্ছাকে একবার উচ্চারণ করা।

কিন্তু এখুনি নয়, চরম সময় আসুক।

'কই কোথায় তোমার ঠাকুর? ডাকছ না কেন তাকে?' চীৎকার করে ওঠে বিভাস। ডাকছি—অসীমা শান্ত, স্থির, সুন্দর। অসীমার মুখে এক অলৌকিক হাসি।

সুযোগ এসেছে, এতদিনে সুযোগ এসেছে। তিন তিনটি হত্যার পাপ স্খালন করতে পারে সে এবার।

স্খালন করবে শুধু একটি প্রার্থনার উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। লুকোনো কৌটো থেকে সেই পরম শক্তিকে বার করে আনে অসীমা। মুঠোয় নিয়ে খুকুর মাথার কাছে বসে :

কিন্তু কই? কই?

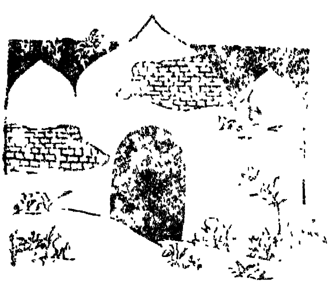
চোখ মেলছে কই খুকু? কই ফিরছে মৃত্যুলীন মুখে জীবনের চেতনা। 'খুকু বেঁচে উঠুক, খুকু সেরে উঠুক' বলতে বলতে যে গলা ভেঙে গেল অসীমার। এরপর কি তবে খাটের রেলিঙে ঠুকে ঠুকে কপালটা ভেঙে ফেলবে অসীমা?

অতএব বিভাসকেই শান্ত হতে হবে, শক্ত হতে হবে, ধরতেই হবে এই উন্মাদিনীকে।

'কী করছো অসীমা? কী হচ্ছে?'

'আমি জানিনা; আমি বুঝতে পারছিনা। এ কোন সর্বনেশে শক্তি পেলাম তবে আমি? আমি তবে শুধু মারতেই পারবো, বাঁচাতে পারবো না?'

বিভাস ক্লান্তস্বরে বলে, 'সমস্ত পৃথিবীই তো সেই শক্তির আরাধনা করছে অসীমা। সেই শক্তির দম্ভে টলমল করছে। যা শুধু মারতেই পারে, বাঁচাতে পারে না। অনেক বিষ আছে আমাদের ভাঁড়ারে, কোটি কোটি লোককে মেরে ফেলার মতো। শুধু অমৃত নেই এককণা। এই ছোট্ট প্রাণটুকুকে ফিরিয়ে আনবার মতও না।'



আয়নাতে

প্রমথনাথ বিশী

বহুদিন পরে অরুণের চিঠি পাইলাম। এম. এ. পাশ করিবার পরে রংপুর জেলায় তাহার বাড়ীতে সে চলিয়া যায়। তাহার পর হইতে আর দেখা হয় নাই, লোকমুখে মাঝে মাঝে তাহার সংবাদ পাইয়াছি, কিন্তু চিঠি পাইলাম এই প্রথম। এম. এ. পাশ করিবার পর প্রায় দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। অরুণের সঙ্গে বাল্যকাল হইতে পড়িয়াছি, সে কেবল সহপাঠী মাত্র ছিল না, কলেজে পড়ার সময়ে আমাদের দুইজনের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছিল। তার পরে ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। তাহার সাংসারিক অবস্থা আমার অজ্ঞাত ছিল না; জানিতাম যে সে জমিদার পুত্র। তাহাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল। আমি এখন ইস্কুল মাষ্টারি করি।

কিন্তু পাঠ্য জীবনের বন্ধুত্ব প্রায়ই কর্ম জীবনের প্রবাহে ছিন্ন হইয়া যায়—তাই অরুণের নীরবতাকে সংসারের অনিবার্য নিয়ম বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম—এমন সময়ে অপ্রত্যাশিতরূপে তাহার পত্র আসিল।

অরুণ পুরানোদিনের স্মৃতি জাগ্রত করিয়া দিয়া আসন্ন বড়দিনের ছুটিতে আমাকে তাহাদের বাড়ী যাইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছে;

লিখিয়াছে যে কলিকাতার জীবনে তুমি অভ্যস্ত এখানে পাড়াগাঁয়ে আসিলে তোমার নিশ্চয় খুব ভালো লাগিবে।

কথাটা মিথ্যা নয়, পাড়াগাঁয়ের প্রতি নিষিদ্ধ ফলের ন্যায় একটা আকর্ষণ আমার আছে।

সে আরও লিখিয়াছে যে, তোমাকে পাড়াগাঁয়েই কাটাইতে হইবে না; ভ্রমণের প্রচুর অবকাশও পাইবে। সে জানাইয়াছে যে, জলপাইগুড়ি জেলায় সে একটি চা-বাগান কিনিয়াছে, আমি পৌঁছিলে আমাকে লইয়া সেখানে বেড়াইতে যাইবে। অরুণের চিঠিতে আছে—"ভাবিও না যে চা-বাগানের কাঠের ঘরে তোমাকে রাত্রিযাপন করিতে হইবে—এখানে একটি প্রকাণ্ড পুরাতন বাড়ীও ছিল, সেটাও কিনিয়াছি। কাজেই তুমি আরামেই কাটাইতে পারিবে। বাঘ ভালুকের ভয়ে রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে না।

সে-অঞ্চলের শোভার মনোরমতা উল্লেখ করিয়া নদী, পাহাড়, বন-জঙ্গল প্রভৃতির লোভ দেখাইয়াছে, বলিয়াছে এমন সুন্দর দৃশ্য অন্যত্র দেখিতে পাইবে না।

না, যাইতেই হইল দেখিতেছি। এতখানি লোভ সংবরণ করিবার কোন হেতু নাই। পাকাবাড়ীর ভিতরে নিরাপদে বসিয়া পাহাড়, বনজঙ্গল দেখিবার লোভ সংবরণ করা সত্যই কঠিন। বিশেষ অরুণের প্রতি চিরকালই আমার একটা আকর্ষণের মতো ছিল—সেটাও অন্যতম কারণ। প্রাকৃতিক দৃশ্যের চেয়েও গভীরতর আকর্ষণ। অতএব বড়দিনের ছুটিতে যাওয়াই স্থির করিলাম এবং পত্রযোগে সে কথা অরুণকে জানাইয়া দিলাম

যথা সময়ে রংপুর জেলায় উপস্থিত হইলাম, অরুণ গাড়ী লইয়া স্টেসনে উপস্থিত ছিল। অরুণ বলিল—এসো, সোজা গাড়ীতে চড়া যাক—পাঁচ-ছয় মাইল পথ যেতে হবে।

কাঁচা পথে টমটম গাড়ী ছুটিতে লাগিল, এবারে দু'জনে কথাবার্তা বলিবার সুযোগ পাইলাম।

অরুণ বলিল—তুমি আসাতে কত যে খুশী হয়েছি বলতে পারিনে।

খুশী অবশ্যই সে হইয়াছে নতুবা কাঁচাপথে শেষরাত্রে স্টেশনে আসিত না।

সে বলিল—তোমার কি শরীর খারাপ? এত রোগা হ'য়ে গিয়েছ কেন? বলিলাম, অনেক ভাবে ওর উত্তর দেওয়া যায়. কিন্তু সবচেয়ে প্রাঞ্জল উত্তর এই যে, ইস্কুল মাষ্টারি করি।

সে হাসিল, বোধ করি মনের ব্যথাকে চাপা দিবার উদ্দেশ্যেই, বলিল, এ যাত্রা ক'দিন থেকে যাও। তারপর মাঝে মাঝে এসো শরীর সারবে।

অরুণের চেহারায় বড় পরিবর্তন ঘটে নাই, শুধু স্বাস্থ্যের রং লাগিয়াছে, বুঝিলাম স্বাস্থ্যের মূলে আছে সচ্ছলতা।

তারপরে চলিতে চলিতে অনেক কথা মনে হইল। সে এখনো বিবাহ করে নাই, আমি অনেকদিন করিয়াছি। ইস্কুলমাস্টার বিবাহের চেয়ে গুরুতর কাজ আর কিই বা করিতে পারে।

দু'দিকে ধান-কাটা শিশির-পড়া সবুজ মাঠ। অরুণের লিখিত পাহাড় দেখিবার আশায় এদিক-ওদিক চাহিলাম—।

অরুণ আমার ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল—ঐ দিকটায় গারো পাহাড়।

অন্য দিকের সহিত সেদিকের প্রভেদ বুঝলাম না, তবু বলিলাম ওঃ, অর্থাৎ দেখিতে পাই আর না পাই—অতবড় সত্যটাকে অস্বীকার করি কি প্রকারে?

ধবলা নদীর তীরে কচুয়া গ্রামে অরুণদের বাড়ী। ঘণ্টা দেড় দুই সময়ের মধ্যে সেখানে পৌঁছিলাম। আদর আপ্যায়নের অভাব হইল না যেহেতু অরুণ নিজে উপস্থিত, আবার বাড়াবাড়িও হইল না যেহেতু মা-মাসির দলের অভাব। অরুণ সংসারে একাকা, একদিকে এখনো বিবাহ করে নাই, অন্যদিকে পিতা-মাতা অনেকদিন গত হইয়াছে।

তাহার বাড়ীঘর ও সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে আগে যেমন কল্পনা করিয়াছিলাম, দেখিলাম তাহার চেয়ে অনেক ভালো। ইস্কুল মাষ্টারের কল্পনাতো, ভরসা করিয়া বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে না।

বিকালবেলা অরুণ বলিল—সুবোধ, তোমাকে এখানে রাখবার জন্যে আনিনি, কাল আমাদের রওনা হ'তে হবে।

অবশ্যই হইবে, তবু অত নির্বিকার হইলে চলে না, শুধাইলাম কোথায়?

—সেই যে চা-বাগানের কথা লিখেছিলাম।

—ওঃ।

—সেখানে পাহাড়, বন-জঙ্গল সমস্তই পাবে।

আরো কিছু পাবো তো?—অর্থাৎ বাসস্থান, আহার্য ইত্যাদি! অরুণ যখন সঙ্গে থাকিবে ওসব চিন্তা ও অবশ্য করিয়াছে।

অরুণ বলিল, এস্টেটের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা বাড়ী আছে, সাধারণতঃ চা-বাগানে যেমন বাড়ী হয়—মোটেই তেমন নয়।

কি বলা উচিত ভাবিতেছি।

অরুণ বলিল—ও বাগান আর বাড়ী দুই-ই ছিল এক সাহেবের। সে হঠাৎ, না, বিলেত চলে গেলে, আমরা সস্তায় সব কিনে নিয়েছি।

অরুণের সস্তা আর ইস্কুলমাষ্টারের সস্তা খুব সম্ভব কাছাকাছি নয়, তাই অঙ্কটার পরিমাণ আর জানিতে চাহিলাম না।

অরুণ বলিল—এখন ওখানে চমৎকার স্বাস্থ্য। আর নানা রকম বুনো পাখী পাওয়া যায়, কত খাবে? এর পরের বার তোমার ছেলে-মেয়েদের এনো।

এক একজন লোকের স্বভাব পরের ভালো করিতে পারিলে আনন্দ পায়—অরুণ সেই জাতের।

—তবে কালই যাত্রা করা ঠিক? কি বলো?

আমি বলিলাম, আমি তো কল্‌কাতা থেকে যাত্রা ক'রে বেরিয়েছি—আমার আবার কিসে আপত্তি?

পরদিন যাত্রার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে অরুণ প্রস্থান করিল।

অরুণ মিথ্যা বলে নাই, এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যই অতুলনীয়। মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যে যাহারা অভ্যস্ত তাহাদের কেমন লাগিবে জানি না, কিন্তু বাংলাদেশের সমতল দৃশ্য-দেখা চোখের তৃষ্ণা আর মিটিতে চাহে না। অদূরে জয়ন্তিয়া পাহাড়ের সারি উঁচুনীচু হইয়া ধূসর দিগন্তের শেষ সীমা পর্যন্ত প্রসারিত, আর ঐ পাহাড়ের পাদদেশ হইতে

যেখানে দাঁড়াইয়া আছি উঁচুনীচু শ্যামল মাঠ, নিকটেই একটা ছোট্ট পাহাড়ে নদী, এত ছোট যে, নামকরণের কষ্ট স্বীকার কেহ করে নাই। এই মাঠের অনেকখানি জায়গা অরুণের চা-বাগান। আগে বাগান ছিল বটে, কিন্তু এখন সম্পূর্ণ জঙ্গলা অবস্থায় পড়িয়া আছে। মাঝখানে একটি পুরানো প্রকাণ্ড বাড়ী: প্রাসাদ বলিলেও হয়, কেল্লা বলিলেও ক্ষতি নাই। এত বড় বাড়ী এখানে কে তৈয়ারী করিল। কেন তৈয়ারী করিল—অদ্ভুত!

বাড়ী যে-ই তৈয়ারী করুক তাহার শখ ও রুচি দুই-ই ছিল। সভ্যতার এই প্রান্তে নির্মিত বাড়ীটিতে আরামের কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি ছিল না। ছিল না বলাই উচিত, কারণ এখন অনেকদিন অব্যবহৃত পড়িয়া থাকায় জীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। অরুণ বলিয়াছিল যে, কোন এক সাহেব চা-কর বাগানের মধ্যে বাড়ীটি তৈয়ারী করিয়াছিল। তার পরে সস্তায় বিক্রয় করিয়া দেশে বিলাতে চলিয়া গিয়াছে।

অরুণ বলিল—সুবোধ, আজ সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, তার উপরে আমার জুলেনও পড়েছে। ... আজ বিশ্রাম করা যাক,—কাল তোমাকে নিয়ে বের হব। ঐ পাহাড়টার কাছে গেলে দেখবে একটা চমৎকার ঝরণা আছে।

আমি বলিলাম— সেই ভালো। আজ আর বেড়াতে ইচ্ছে করছে না।

রাত্রি আটটার মধ্যে আহার শেষ হইয়া গেল।

অরুণ বলিল—চলো, তোমাকে শোবার ঘরটা দেখিয়ে দিই।

তেতলায় একটি মাত্র বৃহৎ কক্ষ—সেখানে আমার শোবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ছাদের বাকি অংশ খোলা, একদিকে একটি গম্বুজ তার মধ্যে নীচতলা হইতে বরাবর একটা সিঁড়ি তেতলা পর্যন্ত উঠিয়াছে; অবশ্য বাড়ির ভিতরের দিকেও আর একপ্রস্থ সিঁড়ি আছে।

তেতলার ঘরটি বেশ প্রশস্ত, ঘরের মধ্যে মূল্যবান মেহগনি কাঠের পালঙ্ক, চেয়ার, টেবিল, আর টেবিলের উপরে প্রস্ত একখানি আয়না। টেবিলের উপরে দুইদিকে মোমবাতিদান। এই সমস্তই পুরানো আমলের অর্থাৎ বাড়ী যে তৈয়ারী করিয়াছিল—এগুলিও তাহারি আমদানী।

শীতের আটটা রাত্রিই অনেক, তারপরে পথশ্রমের ক্লান্তি; কাজেই অরুণ বিদায় হইবামাত্র মোমবাতি দু'টা নিভাইয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িয়া লেপ টানিয়া লইলাম, নিদ্রা আসিতে বিলম্ব হইল না।

কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করিয়া জাগিয়া উঠিলাম। প্রথমেই লক্ষ্য হইল ঘরটা আলোকিত, ভাবিলাম আমি তো মোমবাতি নিভাইয়া শুইয়াছিলাম, আলো জ্বালিল কে? মনে হইল হয় তো কোন কারণে অরুণ ঘরে ঢুকিয়াছিল—সেই জ্বালিয়া থাকিবে।

মাথা ফিরাইয়া দেখিলাম দরজা বন্ধ না খোলা; বন্ধ বলিয়া মনে হইল। এবারে টেবিলের দিকে তাকাইতেই—ওকি! আয়নায় কার ছায়া? একি চোখের ভ্রান্তি না সবটাই স্বপ্ন? চোখের ভ্রান্তি হইতে পারে—কিন্তু স্বপ্ন নিশ্চয় নয়, আমি যে জাগ্রত তাহাতে সংশয় নাই।

ছায়ার পিছনে কায়া না থাকিতেও যে সম্ভব একথা তখন আমার মনে হয় নাই, মনে হইবার কারণও ছিল না, কাজেই ভাবিলাম এত রাত্রে এই অপরিচিত লোকটা আমাকে বিরক্ত করিতে ঘরে ঢুকিল কেন? কে এই লোকটা? পোষাক ও গায়ের রং দেখিয়া সাহেব বলিয়া মনে হইল, সুতরাং ইংরাজীতে শুধাইলাম—তুমি কে?

ছায়া কোন উত্তর দিল না, এমনকি আমার প্রশ্ন শুনিতে পাইয়াছে বলিয়া মনে হইল না, এমন এক দূরাবস্থিত নির্লিপ্তভাব তাহার মুখে-চোখে। তাহার অবজ্ঞায় আমার বিষম রাগ হইল—তখন আমি উঠিয়া বসিয়া কায়াকে সম্বোধন করিবার উদ্দেশ্যে ঘাড় ফিরাইলাম। কিন্তু কায়া কোথায়? লোকটা মুহূর্তে পলাইল নাকি? ঘুরিয়া দেখিলাম আয়নার ছায়াটি অবিচলভাবে বিদ্যমান! একি, কায়া নাই, ছায়া।

আমার শরীর কাঁপিতে লাগিল, মুখ শুকাইয়া আসিল, আমি আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, শুইয়া পড়িলাম। কায়ার চেয়ে ছায়াকে যে মানুষের বেশী ভয়—এই প্রথম বুঝিলাম

আমি যে সব ঘর ছাড়িয়া পালাইব, কিংবা অরুণকে ডাকিব— সে শক্তিও হারাইয়া ফেলিলাম। সেই শীতের রাত্রে শীতল ঘামে আমার শরীর ভিজিয়া উঠিতে লাগিল।

মনে হইল ছায়ার দিকে তাকাইব না—কিন্তু সাধ্য কি? ঐ ছায়ার দিকেই তাকাইতে বাধ্য হইতেছি—এরূপ ক্ষেত্রে ছায়াকে উপেক্ষা করিয়া অন্যদিকে তাকানো মোটেই সম্ভবপর নয়।

একবার চোখ ফিরাই আবার তখনি আয়নার দিকে তাকাই, এক একবার আড়চোখে চাহিয়া দেখি ছায়া আছে না মিলাইয়াছে।

আশ্চর্য! এ ছায়া একবারও আমার দিকে চাহিতেছে না, তাহার পক্ষে আমি যেন নাই। কেন জানি না, একটু একটু করিয়া সাহস ফিরিতেছিল, বোধকরি ভয়ের চরমসীমায় আসিয়া পৌঁছিলে স্বভাবের নিয়মেই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় বলিয়াই হইবে; বোধকরি অভ্যস্ত ভয় আর তেমন ভয়ঙ্কর মনে হয় না বলিয়াই হইবে; কিংবা ছায়ার মুখেচোখে এমন কিছু ছিল যাহাতে আমার বুদ্ধির অতীত সত্তা বুঝিয়াছিল যে, ভয়ের কারণ নাই।

সেই ছায়ার মুখে সে নৈরাশ্য ও বেদনার ছাপ—তেমন কোন জীবন্ত মানুষের মুখে কখনো দেখি নাই ছাপটি যেন আপনাতে আপনি মগ্ন হইয়া কত কি চিন্তায় মগ্ন!

এবারে দেখিলাম পকেট হইতে একখানা ক্ষুর বাহির করিল, এবং আমি বাধা দিবার পূর্বেই (ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, বাধা দিবার শক্তি আমার নাই) নিজের গলায় ক্ষুরখানা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। তাহার মুখ পাণ্ডুর বিবর্ণ হইয়া গেল, শাদা সার্টের বক্ষদেশ রক্তে ভাসিয়া গেল এবং ছায়াদেহ মৃতদেহের মতো মাটিতে পড়িল।

এতক্ষণ আমি মুগ্ধবৎ সব দেখিতেছিলাম—হঠাৎ এবার সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া শয্যাত্যাগ করিয়া, দরজা খুলিয়া একদৌড়ে বাহিরে ছাদের উপরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। তখনো পূর্বদিকে উষার পূর্বাভাস জাগে নাই, কেবল ভোরের প্রথম ফিঙাটি কুণ্ঠিত ডাক সুরু করিয়াছে। আমি সোজা অরুণের দোতলার শয়নকক্ষের বন্ধ দরজায় আসিয়া ধাক্কা মারিলাম—ওঠো, ওঠো।

চা-পানের পর অরুণকে বলিলাম—কি, বিশ্বাস হ'ল না বুঝি!

অরুণ বলিল—যা নিজেও দেখেছি তা বিশ্বাস না করবার হেতু নাই।

—তুমি দেখেছ ?

—হ্যাঁ।

—কেমন ক'রে ?

—তুমি যেমন ক'রে দেখলে, ঐ ঘরে শুয়েছিলাম।

—তবে জেনে-শুনে আমাকে ওঘরে শুতে দিলে কেন ?

—আমি ভেবেছিলাম যা দেখেছি তা মনের ছলনা মাত্র অর্থাৎ গল্পে যা শুনেছিলাম রাত্রে তাই দেখলাম, ভাবলাম সবটাই সাব্‌জেক্‌টিভ—

—ও:, তাই আমাকে দিয়ে পরীক্ষা ক'রে নিলে ?

—সত্য ভাবলে তোমাকে পরীক্ষার মুখে ঠেলে দিতাম না ভেবেছিলাম সবটাই গল্প।

—কার কাছে শুনলে গল্প ?

—সাহেবের চাপরাশির কাছে, সব ব্যাপার সে নিজে চোখে দেখেছিল

—কোন সাহেবের চাপরাশি ?

—যার এই বাড়ী ছিল।

—সবটা গুছিয়ে বলো শুনি।

অরুণ আরম্ভ করিল—বাড়ীটা ক'রেছিল মিঃ টমাস। চা-বাগান ছিল তার। দূরে দূরে আরও অনেক চা-বাগানের মালিক ছিল সে। স্ত্রী ছাড়া আর তার কেউ ছিল না। একদিন কল্‌কাতা থেকে সাহেবের এক বন্ধু এসে হাজির হ'ল, মিঃ টমাস স্ত্রীর উপর তার আতিথ্যের ভার দিয়ে হঠাৎ দার্জিলিঙে চলে যেতে বাধ্য হ'ল। যেমন হঠাৎ যাওয়া তেমনি ফেরাও হঠাৎ। এসে দেখল, আতিথ্যটা খুব ঘনিষ্ঠভাবেই চলছে। টমাসের রুদ্রমূর্তি দেখে বন্ধু তো তখনি পলাতক —স্ত্রী আর কোথায় পালাবে।

—তার পরে ?

—তার পরে সেই রাত্রেই টমাস তেতলায় ঐ গম্বুজের মধ্যে স্ত্রীকে টেনে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

—হত্যা ?

—হ্যাঁ, গুলি ক'রে মারে, তারপর নিজেদের শয়নঘরে এসে, ওটাই শোবার ঘর ছিল, গলায় ক্ষুর বাধিয়ে আত্মহত্যা করে।

—এ সব দেখলো কে ?

—ঐ যে বললাম সাহেবের চাপরাশি। সে সব প্রত্যক্ষ দেখেছিল।

—এ কতদিনের আগের কথা ?

—প্রায় ত্রিশ বছর হবে।

—বাড়ী তো কিনেছ মাত্র বছর খানেক।

—হ্যাঁ, ঐ ঘটনার পর থেকে বাড়ীটা পড়েই ছিল, চা-বাগান করবার শখ হওয়ায় কিনেছি।

—সে চাপরাশিকে পেলে কোথায়

—সাহেব তাকে কিছু জমি কিনে দিয়েছিল—চার-পাঁচ মাইল দূরে একটি গ্রামে সে থাকতো।

—তার মানে এখন নেই ?

—না, অল্প কয়েকমাস আগে লোকটা মরেছে।

—তোমার সঙ্গে পরিচয় হ'ল কি ক'রে ?

—আমি বাড়ীটা কিনেছি শুনে দেখা করতে এসেছিল, তার কাছেই গল্পটা শুনেছিলাম।

—একে এখনও গল্প বলছ কেন ?

—হ্যাঁ, দু'জনের চোখে যখন যাচাই হ'য়ে গেল, তখন আর গল্প বলা উচিত নয়।

—তুমি কি দেখেছিলে ?

—তুমি যা কাল দেখেছ। তবে আগে গল্পটা শুনেছিলাম বলে বিশ্বাস করিনি! আর পাছে তুমি গল্প শুনে তার দ্বারা প্রভাবিত হও তাই আগে তোমাকে বলিনি।

দু'জনে চুপ করিয়া রহিলাম। অরুণ বলিল, শোবার ঘরে ঘটনার যেটুকু দেখলে তার পূর্বার্ধ—

—অর্থাৎ স্ত্রীকে হত্যা ?

অরুণ বলিল,—হ্যাঁ, ঘটেছিল গম্বুজের মধ্যে ; শুনেছি সেই নিদারুণ অংশটুকুরও ছায়াভিনয় চলে প্রতি রাত্রে ঐ গম্বুজের অন্ধকারে।

—কি ক'রে জানলে ?

—আমাদের সরকার মশাই কি যেন দেখেছিলেন।

—কি ?

—তা ঠিক তিনি বলতে পারলেন না, ছুটে পালিয়ে এসেছিলেন। তারপরে একটু থামিয়া বলিল—যাবে আজ রাত্রে ? চেষ্টা করবে দেখতে ? আমি বলিলাম –চলো।

স্থির হইল দু'জনে আজ তেতলার ঘরে শয়ন করিব—এবং রাত্রি ভোর হইবামাত্র একটা টর্চবাতি সঙ্গে করিয়া গম্বুজে প্রবেশ করিব—দেখা যাক্—আর কি ছায়ারহস্য প্রকাশ পায়।

দু'জন সারাদিন শঙ্কাময় রহস্যের আবহাওয়ায় দণ্ডপল গুণিতে লাগিলাম—কখন সন্ধ্যা হয়, কখন রাত্রি হয় !

কিন্তু আমাদের আশঙ্কাময় আশা পূর্ণ হইল না। হঠাৎ বিকাল বেলায় কলিকাতা হইতে জরুরী তার পাইয়া আমাকে তখনি রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল।

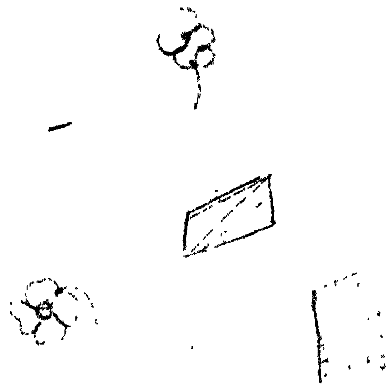
অরুণ বলিল—চলো, আমিও যাই, এ বাড়ীতে আর একা নয়।

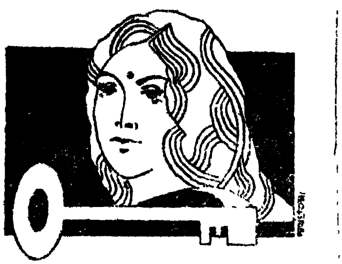
—এখন বুঝি বুঝছো যে, ওটা আর চোখের ছলনামাত্র নয় ?

—ঠিক তাই।

সন্ধ্যার সময়ে দু'জনে স্টেশনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। রাস্তা মোড় ফিরিবার আগে একবার বাড়ীটার দিকে তাকাইলাম, দেখিলাম ছায়ারহস্যময় বাড়ীটা নিবেট এক ছায়ার মতো নীরবে দণ্ডায়মান। মানব জীবনের নিদারুণ একটা ট্র্যাজেডির সাক্ষী ঐ নীরব অট্টালিকা। প্রতি রাত্রে ওরই একান্তে ট্র্যাজেডির ছায়াভিনয় চলিতে থাকে। কেন, কি উদ্দেশ্য, কে বলিবে ?

তবে ইহা নিশ্চয় করিয়া প্রত্যক্ষ করিলাম যে, সময় বিশেষে ছায়া কায়ার চেয়েও সত্যতর হইয়া উঠিতে পারে।





চাবি

আশা দেবী

মাঝরাতে একটা ঝোড়ো হাওয়া প্রভাত বিশ্বাসের কাঁচের জানালার ওপর আছড়ে পড়ল। যেন মনে হল দূরের পাহাড় পেরিয়ে ঝাউগাছগুলোর মাথার ওপর দিয়ে সে যেন ওই জানালাটা লক্ষ্য করেই ছুটে আসছে, তারপর সেই ঝোড়ো হাওয়া ঠিক কান্নার মত সবেগ উচ্ছ্বাসে জানালার খড়খড়িগুলোকে বুক চাপড়ানোর মত আওয়াজ করে খুলে ফেলল। আর যেন ঝোড়ো হাওয়ায় দূরের ভেসে আসা ফুলের গন্ধের মত একরাশ গন্ধের সঙ্গে পালকের মত লঘু পায়ে কে যেন ঘরের ভেতর নেমে এল। তারপর সেই কোরা শাড়ির গন্ধ, চেনা চেনা মিষ্টি মিষ্টি গায়ের গন্ধ, চুলের গন্ধ আর গরম গরম নিশ্বাসে কে যেন ঘরটা ভরে দিল। প্রভাত অনুমান করল অন্নু এসেছে।

ক'দিন বৃষ্টি নেই। প্রচণ্ড গুমোট চলছে। পাহাড়ে এমন গুমোট সচরাচর দেখা যায় না। মনে হচ্ছে একটা প্রবল ঝড়-বৃষ্টির পূর্ব সঙ্কেত। প্রভাতের ঘরটার বাইরে যেন শব্দহীন পাহাড়ী রাজ্যের স্পন্দনহীন অন্ধকার রাতটা যেন তার অনুভূতিগুলোকে স্তিমিত করে আনছে। যেন মনে হচ্ছে, বাইরের এই পাহাড়ী-পাথুরে অন্ধকারটা তার বুকটাকে দুহাত দিয়ে চেপে ধরতে চাইছে।

বাইরের নিঃশব্দ পৃথিবী—ভেতরে নীরন্ধ্র অন্ধকার। এই নিথর রাতের আঁধারে যেন তার ইন্দ্রিয়গুলো এই মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে তার কে যেন জানালার কাছে এসেছে। শাঁখের মত সাদা আর সরু সরু আঙুলগুলো দিয়ে খড়খড়ির কাঠগুলো তুলছে, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তার খাটের কাছে। আরো কাছে—এগিয়ে আসছে সে।

—বাহাদুর—বাহাদুর! নিলো—নিলো আমার সিন্দুকের চাবি নিলো। বিকৃত কণ্ঠে প্রভাত চিৎকার করে উঠল। তারপর তীরের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই শীতের রাতেও সে ঘেমে নেয়ে গেছে। উত্তেজনায় ছুটে সে ঘরের কোণার সুইচ-বোর্ডটার কাছে গিয়ে আলো জ্বালালো। মাথার মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা দিচ্ছে কে। ঘরের আলোটা জ্বলে উঠতেই যেন ছায়াবাজীর মত দেয়ালের গায়ে অনু আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল।

প্রভাত বিছানার ওপর বসে পড়ল ধপ করে। নিজেকে একটু সংযত করে নিয়ে সে আবার চারিদিকটা বেশ করে চেয়ে দেখল। আলোটা ভারী ঘোলাটে লাগছে। কতদিনের পুরনো আর ময়লা বাল্‌ব। ধুলো-ময়লা পড়ে পড়ে ওর জোর কমে গেছে। চারিদিকে মাকড়সায় জাল বুনেছে। সেই মাকড়সার জালের তার বেয়ে নেমে আসা আলোর ক্ষীণতম রশ্মিগুলোতে চুন-বালি ওঠা দেওয়ালগুলোকে যেন ক্রুর শ্বাপদের দাঁতের মত লাগছিল। কারা যেন অজস্র অঙ্গুলির সংকেতে তাকে শাসিয়ে চলেছে একটানা।

প্রভাত ঘর-বার, খাটের তলা, আলমারীর পাশ সব দেখল খুঁজে।

অনু কোথাও নেই। দরজার হুড়কো তেমনি বন্ধ। তবে কে বালিশের নীচের চাবি নিতে এসেছিল? প্রভাত বালিশ তুলে দেখল, সেটা সেখানেই পড়ে আছে। আলমারীর পাশে লোহার সিন্দুক তেমনি ছেঁড়া অয়েলক্লথ দিয়ে ঢাকা। ধুলোয় ধুলোয় সিন্দুকের গায়ের লাল স্বস্তিক চিহ্নটা একটা ক্ষতের মত তেমনি কালো হয়ে তাকিয়ে আছে। কেউ যে এতে হাত দিয়েছে এমন তো মনে হচ্ছে না। তবে—?

প্রভাত বিছানা ছেড়ে উঠে বসল। ভাঙা দাঁতের ওপরের কাটা ঠোঁটটার ভেতর থেকে সরীসৃপের মত বার কতক লাল জিভটা নাড়ল। এবার যেন তার অনুভূতিগুলো একটু একটু করে আসছিল। হঠাৎ মনে হল বড্ড তেষ্টা পেয়েছে, ঘরের ভেতরে রাখা কাঁচের কুঁজোটা থেকে ঢক ঢক করে খানিকটা জল সে খেয়ে ফেলল। তারপর ধপ করে বিছনায় বসে পড়ল। অনু এসেছিল। প্রভাত জানত সে আসবেই, আসবেই তার গয়নার আকর্ষণে।

পাগলের মত ছুটে এসে সে জানালাটা খুলে দিল, তারপর দূরে সন্ধানী চোখ মেলে কাকে যেন খুঁজতে লাগল সেই নিকষ-কালো অন্ধকারের ভেতর। ওই যে পেনসিলে আঁকা পাহাড়ের সারি আকাশের বুকে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে তাদেরই মাথার ওপর দিয়ে হয়তো ওই দমকা ঠাণ্ডা হাওয়াটা ছুটে এসেছিল পাগলের মত কালো কালো পাইনের মাথাগুলো কেঁপে কেঁপে শিউরে শিউরে উঠেছিল যেন সেই হিমেল স্পর্শে। পাহাড়ের বুকের গ্রামগুলোর ঘুমন্ত গৃহস্থের ঘরের নিবু নিবু আলোগুলোকে যেন সে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল সহসা। হঠাৎ যেন বাজপড়া নেড়া গাছটার ওপর শকুনের ছানাটা চীৎকার করে ককিয়ে কেঁদে হঠাৎ চুপ করে গেল কাকে দেখে। আর কে যেন ছুটে আসছে সাদা কঙ্কালের আঙুলের ধোঁয়ায় কালো বুকপোড়া চোরা লণ্ঠন হাতে ধরে। আর দেখতে দেখতে সেই ঘরের চালে সেই গাছের মাথায় পুঞ্জ পুঞ্জ হিমানী জমে রূপ নিল অনু আর সেই মায়াময়ীর কায়া যেন অনায়াসেই কায়া গ্রহণ করে জানালার ভেতর দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল।

তারপর তার ব্রোঞ্জের চুড়ির কর্কশ ঠুনঠান, শাড়ির আওয়াজ আর

মাথার তেলের গন্ধ ঘর ভরে দিয়েছিল। প্রভাত তাকে দেখেছে নইলে সে বুঝল কি করে অনুকে।

বাইরে থেকে বাহাদুর ডাকছে—বাবু—বাবু কী হল? দরজা খোল। কিন্তু প্রভাত দরজা খুলল না শুধু পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল যেন কাকে খুঁজছে—যেন দরজা খুললেই সে পালিয়ে যাবে।

এমনি সে প্রায়ই করে। বাহাদুর পুরনো চাকর, সে সবই জানে। অনুকে দোতালার জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে খুন করবার পর থেকেই সে এমনি করে স্ত্রীর গহনা পাহারা দিয়ে চলেছে যক্ষের মত অনুর হাত থেকে। তবু মনে হয় পারবে না, সে কিছুতেই পারবে না। অলঙ্কার-লোলুপতা অনুর মৃত্যুর পর আরো বেড়েছে, সে ওগুলো নেবেই—এই কথাটা ভাবতে ভাবতে যেন তার মাথার শিরা-উপশিরাগুলো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যেতে চাইছে যন্ত্রণায়। যদি তার একটা রাতও নিশ্চিন্তে ঘুম হত তাহলে হয়তো সে বাঁচতে পারত।

বাড়ির নাম 'প্রভাত-কিরণ'। এই ইতি-কথা বড় বিচিত্র। এই শহরের পথে পথে সিগারেট ফিরি করে বেড়াত প্রভাত। ক'টা পয়সাই বা হয় এতে। কখনও একবেলা ভাত জোটে, কখনও অনাহার। হঠাৎ যুদ্ধ বাধল। চারটে ভাঙ্গা দাঁত আর কাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে হাসির ঝিলিক খেলে গেল তার মুখে। সরস্বতীকে ক্লাস সেভেনে বিদায় দিলেও লক্ষ্মীকে কি ভাবে লোহার সিন্দুকে বাঁধতে হয় তা সে জানত। যুদ্ধের সুযোগে ভুটিয়াদের মারফৎ তিব্বতে সে সিগারেটের চোরাকারবার করত। আরো যেন কী কী চালান দিত কে জানে, চক্ষের নিমেষে কাঁচা টাকা আর সোনার বারে তার সিন্দুক ভরে উঠল।

গরিলার মত লোমশ হাতে কানের ওপর থোপা থোপা চুলগুলো টেনে টেনে ফাঁকা দাঁতের পাশে লিকলিকে জিভটা নেড়ে নেড়ে হাসত প্রভাত। কি সুখী কি সুখী সে। নিজের নামে বাড়ি করেছে সে।

সবাই ধরে বসল—বিয়ে কর। কেউ নেই, কে দেখবে। প্রভাত এবার জন্তুর মত অর্থহীন দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল। তাকে বিয়ে করবে কে? যার চোখ আছে সে কিছুতেই সাহস করবে না।

কিছুদিন বেশ কেটে গেল। এবার বিয়ের প্রসঙ্গে তার মুখে রহস্যের হাসি। এরও তিনমাস পর একদিন সকলকে বিস্মিত করে চৌমাথার মোড়ে বৌ নিয়ে নামল প্রভাত। সবাই বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল। অফিসের লেট হয়ে গেল তবু কোন মন্তব্য পর্যন্ত করতে পারল না। অপূর্ব সুন্দরী অনু—তার সারা শরীর গয়না আর বেনারসীতে ঝলমল করছে। সবাই বললে, এ গরিলার গলায় হীরের হার পরালো কে?

গয়না প্রভাতই দিয়েছিল। মনে মনে ছিল স্ত্রীকে দেওয়া মানেই ঘরে থাকা। তাছাড়া সুন্দরী বুদ্ধিমতী অনু প্রথমে একেবারে বেঁকে বসেছিল। কিন্তু গরীবের মেয়ে, সাজতে-গুজতে গয়না-গাঁটিতে তার বড় লোভ। সেই রন্ধ্রেই শনি প্রবেশ করল এবং সে প্রভাতের ফাঁদে পা দিল।

পাহাড়ের কোলে বিরাট বাড়ি, বাগান। এমন স্বামীর ঘর অনু আশাও করেনি। কিন্তু আশ্চর্য, এই ক'দিনেই যেন সে অনুভব করল প্রভাতের চোখ তাকে সমানে পাহারা দিয়ে ফিরছে। কিছুদিন আড়ে আড়ে কথা বলে তারপর একদিন বলেই ফেলল প্রভাত—গয়নাগুলো খুলে রাখ। সর্বদা ব্যবহার করলে ক্ষয়ে যাবে।

—সেকি? তবে দেবার দরকার ছিল কী?

—আমি তোমার সর্বদা ব্যবহারের জন্যে ব্রোঞ্জের চুড়ি তৈরি করে রেখেছি।

—না, আমি গয়না খুলব না। অনু গলার হারটা দুহাতে চেপে ধরলো। রোল্ড গোলডের হার পরব না আমি। ছিঃ—

—ছিঃ আবার কী? সবাই তাই করে। তুমিও করবে।

না, আমি করব না। দৃঢ়স্বরে অনু জানিয়েছিল। কিন্তু কথা তার টেঁকেনি। প্রভাত ঠিক তখনই নেয়নি, কিন্তু তার ক'দিন পরই নিয়েছে জোর করে। যেন সে এত সোনার এভাবে অপচয় সহ্য করতে পারছে না। ব্যবহার করলে সোনা ক্ষয়ে যায় যে।

অনু ক'দিন চেয়েছে, অভিমান করেছে। তারপর হাতে ক'গাছা ব্রোঞ্জের চুড়ি ছাড়া কোন গহনাই পরেনি। আর মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে প্রভাত—কী লোভী মেয়েটা! কী ভীষণ লোভ ওর গয়নার ওপর, নইলে গরিলার মত স্বামীর চেহারা দেখেও বিয়ে করবে কেন!

বিয়ে তো করেছে সে গয়না-শাড়িকে, প্রভাতকে নয়। কাছে ডাকলে আসে না। সর্বদা দূরে দূরে থাকে। মনে হয় যেন কেমন ভয় করে তাকে। বেশ তো ছিল, কী দরকার ছিল তার বিয়ে করবার। তার সুন্দরী স্ত্রী—ইচ্ছে করে অনুকে দূর করে দেয় বাড়ি থেকে—সামনের কাটা ঠোটের দণ্ডহীন গহ্বরের ফাঁক দিয়ে যেন সরীসৃপের মত জিহ্বাটা তার লিক লিক করে ওঠে। এই সময় যেন তাকে ভারি বীভৎস লাগে দেখতে।

হঠাৎ তার সামনে চোখ পড়তেই দেখে অনু জানালার কাছ থেকে দুচোখে ভয় নিয়ে ছুটে পালাচ্ছে যেন পায়ের কাছে সাপ দেখেছে সে।

বাজারেব সামনে একটা হোটেল খুলেছে। দিনরাত সে তাই নিয়েই ব্যস্ত, বাড়ি প্রায় ফেরা হয়ই না। আজ সে বাড়ি ফিরবেই যত রাত হোক। বাহাতুর অবশ্য বাড়ি ফেরবার জন্য রোজই বলে, এও বলে, না ফিরলে হয়তো খুবই ক্ষতি হবে। কিন্তু প্রভাত নিরুপায়। চীনা সীমান্তে যুদ্ধ লেগেছে। এখানে কত সৈন্যের আমদানী হচ্ছে, একটা ভাল হোটেল খুললে এ সময়ে লাল হয়ে যাবে সে। বাড়ি তো আছেই চিরকালের, এই মওকায় কিছু টাকা সংগ্রহ করে নিতে দোষ কি? —সুযোগ জীবনে ক'বার আসে?—কিন্তু যাক সে সব কথা। সে আজ বাড়ি ফিরবেই।

একটা পুরু ইটালিয়ান কম্বল গায়ে জড়িয়ে সে নির্জন বনের পথ ধরে অন্ধকারে একা বাড়ির পথ ধরল।

কুয়াশা, শীত, হাওয়া আর এই আঁকাবাঁকা পথ। একটু দেরিই হল বাড়ি ফিরতে। কিন্তু বাড়ির সামনে এসে চমকে থেমে গেল প্রভাত। অনু হাসছে আর কথা বলছে যেন কার সঙ্গে। কি সুন্দর সে হাসি! এমন করে আবার যে অনু হাসতে জানে, না দেখলে প্রভাত বিশ্বাস করত না।

গলাটা ভূপতির না? তারই কর্মচারী ছোকরা। অনুরই দেশের ছেলে। ভারি সুপুরুষ দেখতে। অনুরই অনুরোধে প্রভাত ওকে চাকরি দিয়েছে। তখন বোঝেনি, খাল কেটে সে কুমীর এনেছে।

—আমি আর থাকব না ভূপতি, তুমি আমাকে বাঁচাও। ওরা আমাকে

সারাদিন পাহারা দেয়। বাড়ি থেকে বাগানে পর্যন্ত নামতে দেয় না, সব গয়না-পত্র কেড়ে নিয়েছে। তুমি আমায় নিয়ে চল।

—আমি তো তখনই বলেছি। মানুষ জন্তুর সঙ্গে থাকতে পারে না।

—তুমি আমাকে বাঁচাও।

—চাবিটা নিয়ে গয়নাগুলো হাত কর। তারপর চল যাই চলে।

—চাবি নেব কি করে? ওর ট্যাঁকে থাকে যে।

—দেখ না, বুদ্ধি করে কিভাবে নেওয়া যায়।

আর সহ্য হল না প্রভাতের। সে ছুটে এসে দরজায় ধাক্কা দিল।

—দরজা খোল অনু।

ওদিকে জানালা বন্ধের আওয়াজ এল। তারপর অনু দরজা খুলতেই সে বাঘের মত অনুর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

লুকিয়ে লুকিয়ে হাসি আর প্রেম! বের করছি সব। আমি জন্তু? বেশ, দেখাচ্ছি তোর মজা।

কুকুর বাঁধা শেকল দিয়ে খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে প্রভাত অনুকে পিশাচের মত চাবুক দিয়ে পিটলো। অনু দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইল। ঘৃণায় লজ্জায় তার চিৎকার পর্যন্ত করতে ইচ্ছে করল না। শুধু ভয় হতে লাগল ওই শ্বাপদটার ভাঙা দাঁত আর কাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে লিকলিকে জিবটা বেরিয়ে কখন তাকে একেবারে শেষ করে ফেলবে। খানিকটা পরই অনু জ্ঞান হারিয়েছিল।

সামনের জানালার কাছে দপ দপ করে জ্বলছে ভূপতির দুটো চোখ। অন্ধরাগে যেন ফেটে পড়তে চাইছে সেই অগ্নিপিণ্ড দুটো।

এর পর কিছুদিন বেশ চুপচাপ কাটল। প্রভাত নিয়মিত কাজকর্ম করতে লাগল আর অনু আপনার মত এতবড় বাড়ির কোন কোণে গৃহকর্ম নিয়ে ব্যস্ত তার খবর কেউই রাখবার প্রয়োজন বোধ করল না।

মাঝে মাঝে প্রভাতের কেমন আত্মজিজ্ঞাসা জাগত। তখন মনে হত তারও আজকাল এমন করে ভালবাসা, স্নেহ, মায়ার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে?

শনিবারের হাট থেকে ফিরে প্রভাত মুখর কণ্ঠে ডাকল—অনু, অনু, অনুপমা!

অনুর কানে সে ডাক যেতেই সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আবার ডাক এল—কী এনেছি, দেখ এসে।

বেরিয়ে যাবার সময় ট্যাঁকের চাবিটা ফেলে গিয়েছিল প্রভাত। এখন সেটা অনুর চোখে পড়েছে। দেবে কী দেবে না ভাবতে ভাবতেই আবার ডাক এল—অনু আমার সর্বনাশ হয়েছে, চাবি ?—ছুটে পাগলের মত সে ঘরে ঢুকল।

দ্রুত কতকগুলো চিন্তা বিদ্যুতের মত খেলে গেল তার মাথায় আর মুহূর্তে পাকা অভিনেত্রীর মত একগাল হেসে সে বললে—এই তো এখানে পড়ে। পাগলের মত কোথায় খুঁজছ তুমি ?

—দাও—দাও, বলে হাত বাড়িয়ে ছুটে এল প্রভাত—আলমারী-টালমারী আবার খোল নি তো ?

—কি যে বল! এখুনি তো পেলাম এই তোমার ডাক শুনে আসতে গিয়ে।

—ঠিক তো ? আগে পাওনি তো ? বলেই সে চাবি নিয়ে ছুটে গেল, আলমারী খুলে দেখল। না, সব ঠিক আছে।

আর বাঁকা চোখের সকৌতুক দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল অনু। যেন একটা মজার খেলার দর্শক সে।

এবার ছুটে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললে—দেখ, তোমার জন্যে কি এনেছি। শাড়ি-সাবান-স্নো পাথরের মালা। গলাটা খালি থাকে কিনা, ভাল দেখায় না। নাও—অনু। অমন করে চেয়ে আছ কেন ?

নিথর হয়ে জমে যাওয়া হৃৎপিণ্ডটাকে অনু যেন নাড়া দিয়ে জাগাতে চাইল আর একবার। "আর অভিনয় করা সম্ভব নয়। বরং নিষ্ঠুরতা ভাল। এ সোহাগ সহ্য হয় না আর। ফাঁকা দাঁতের ফাঁকের কাটা ঠোঁটের এই বিকট হাসি তার আরো অসহ্য। সে ধীরে ধীরে মৃতের মত পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পাশের বাড়ির ভূপতির জানালার দিকে খানিক তাকিয়ে কি যেন

ভাবল প্রভাত, তারপর পকেট থেকে ক্যাশমেমোটা বের করে একবার দেখে নিয়ে সাবধানে জিনিসগুলো তুলে রাখল। আর এতগুলো টাকা বেঁচে গেল ভেবেই কি একটা বাঁকা হাসির রেখা ঠোঁটের কোণে খেলে গেল না অন্য কিছু সে অনুভব করল ?

রাতে অনুর ঘুম হল না। কেবল এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। প্রভাতের সশব্দে নাক ডাকছে। সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

ঘরটা যেন তিমির তীর্থ। শীতের দেশ—সব কেমন স্যাঁৎ-স্যাঁৎ করছে বলে মনে হয়। চারিদিকে ধুলোর গন্ধ—জিনিসপত্রের দম বন্ধ করা গুমোট ভাব যেন অসহ্য লাগছে তার। দিনের বেলায় এসব তো কিছুই মনে হয় না। কিন্তু রাতের অখণ্ড অবসরে এরা যেন একটা অখণ্ড রূপ নিয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়।

ভূপতি বলেছে পালাতে হবে। জানালার কাছে সে সংকেত করেছে। পথে দাঁড়িয়ে থাকবে। আর দেরি করা চলবে না। এখুনি পালাতে হবে। কিন্তু চাবিটা প্রভাতের ঘুনসিতে বাঁধা—হাতটা তার ওপরে আছে। কিন্তু গহনা না নিয়ে সে কিছুতেই যেতে পারবে না—প্রাণ গেলেও নয়। এই গহনার জন্যে তার আজ এত কষ্ট!

কি করে চাবিটা নেওয়া যায় ? অনু ধীরে ধীরে প্রভাতের পাশে এসে বসল। ধীরে ধীরে মাথায় কপালে হাত বুলোতে লাগল। আর ঘুমের ঘোরে দুর্বলতার মুহূর্তে প্রভাত অনুকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল। ধীরে ধীরে অনু চাবিটা কোমর থেকে খুলে নিলো।

আলমারীটা খুলতেই হয়তো শব্দ হয়েছে। হঠাৎ প্রভাত চিৎকার করে উঠল—বাহাদুর—বাহাদুর, চোর—চোর। বলেই ছুটে গিয়ে ইলেট্রিকের বোতামটা টিপে দিতেই আলো জ্বলে উঠল। আর প্রভাত বাঘের মত লাফিয়ে গিয়ে অনুর ঘাড়ে পড়ল।

—চোর—শয়তান—

অনু সোজা হয়ে দাঁড়াল—নিজের জিনিস নেওয়া চুরি নয়। তাছাড়া আমি কি এ বাড়ির কেউ নই ? আলমারীতে হাত দেবারও আমার অধিকার নেই ?

—না, নেই। তোমার কিছুতেই কোন অধিকার নেই এ বাড়ির।

—নিশ্চয়ই আছে। আমার গয়না দিয়ে দাও। আমি চলে যাব।

—ভূপতির সঙ্গে? মুখবিকৃত করে প্রভাত বলল।

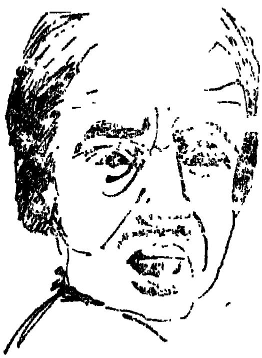
—হ্যাঁ, ওর সঙ্গেই যাব। আমার ওকে ভালো লাগে।

—তবে রে! যাও, ওর কাছেই তোমাকে পাঠাচ্ছি। বলেই জানালা খুলেই সেই নিথর জঙ্গলের অতলান্তে অনুকে এক ধাক্কায় ফেলে দিয়ে জানালা বন্ধ করে দিল। পেছনের ঝরনার কলতানের সঙ্গে অনুর চিৎকার যেন মিশে রাতের আকাশকে বিদীর্ণ করে দিল। আর তখুনি কালো আকাশ চিরে বিদ্যুৎ চমকালো আর সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ী ঝড় আর আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি নামল বিশ্রামহীন সংযমহীন ভাবে একটানা সাতদিন। নীচের মুখর ঝরনা আরো মুখর হল। বড় বড় পাথর টেনে আনতে লাগল—গাছপালা ভেঙে জলের স্রোত চলল তিস্তার দিকে ছুটে। পাথরের নীচে কোন গুহার অন্ধকারে অনু চিরনিদ্রায় নিথর হয়ে রইল কে তার খবর রাখে?

অনু চলে গেল চিরদিনের মত, কিন্তু প্রভাতের দ্বিতীয় চেতনা যেন মনের কাছে একটানা প্রলাপ বকে চলল। প্রতি রাতে তারপর থেকে আর্তচিৎকার শোনা যেত। রাত যেন বিভীষিকা। তার সব শান্তি —ঘুম যেন কেড়ে নিলো অনু। রাতের পর রাত জেগে সে সেই বন্ধ জানালার কাছে বসে চিৎকার করে। ডাক্তারের পায়ে ধরে বলে— আমার সব নাও ডাক্তারবাবু, আমায় একরাত ঘুমোতে দাও।

কিন্তু অনু তার ঘুম কেড়ে নিয়ে গেছে। সারা রাত মনে হয় কে যেন আসে। কে যেন তার ঘরে ঢুকছে। তার শাড়ির গন্ধ, চুড়ির শব্দ, পায়ের আলতো আওয়াজ আর রাতের অন্ধকারে উত্তপ্ত নিশ্বাসের স্পর্শ আর চাবির শব্দ প্রভাতকে পাগল করে তোলে।

অনু এসেছিল। নিশ্চয়ই এসেছিল। বন-প্রান্তর পাইনের সারির ওপর দিয়ে দূর দুরান্তর সপ্তসিন্ধু পার হয়ে মৃত্যুর অন্ধকার থেকে। জীবন্তকে খুন করা যায় কিন্তু মৃতকে খুন করবে কেমন করে? প্রভাত চিৎকার করে উঠল—চাবি, দাও অনু। নইলে খুন করব।



নিয়তি পুরুষ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

রাত প্রায় পৌনে বারোটা। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে।

সেই জন্যই রাস্তাঘাট এর মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেছে। লাস্ট বাস থেকে নামবার সময়ই আমার পা টা মচকে গেল।

বেশী রাত্রির বাস এমনিতেই ঝড়ের বেগে ছোটে। কোথাও বেশীক্ষণ থামতেই চায় না। যাত্রী খুব কম। টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর কাছে একমাত্র আমিই নামবো। দরজার কাছে হাতল ধরে দাঁড়ানো মাত্র কণ্ডাকটর গাড়ি ছাড়ার ঘন্টা দিয়ে দিল। চলন্ত গাড়ি থেকে আমাকে লাফিয়ে নেমে পড়তে হলো।

হুমড়ি খেয়ে পড়েই যেতাম। অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়েছি। কিন্তু বাঁ পায়ের গোড়ালির কাছে বেশ চোট লেগেছে। একটু হাঁটতে গিয়েই বুঝলাম রীতিমতন ব্যথা।

এই সময় একটা রিক্‌শা পেলে ভালো হতো। অন্যদিন অনেক রিক্‌শা থাকে এখানে। আজ বৃষ্টির জন্য রাস্তা ফাঁকা, তাই রিক্‌শাও

নেই। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। বৃষ্টির মধ্যে এখন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যেতে হবে।

দু'একটা রিক্শা ফুটপাথের ওপর তুলে রেখে তাদের চালকরা ঘুমোচ্ছে। ডেকে তুললে অনেক সময় ওরা যেতে চায় না। মেজাজ দেখায়। কি করবো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি। এই সময় পেছনে ঠুং ঠুং শব্দ কানে এলো। একটা ফাঁকা রিক্শা। বুড়ো মতন একজন লোক সেটা চালাচ্ছে। মাথার ওপরে এক টুকরো প্লাস্টিক টুপীর মতন পরে আছে। সে নিজেই আমাকে জিজ্ঞেস করলো, বাবু যাবেন ?

এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। কোনো দরাদরি না করে উঠে বসলাম। মেজাজটা আবার একটু প্রসন্ন হতে একটা সিগারেট ধরালাম।

বড় রাস্তা থেকে আমার বাড়ি মিনিট সাতেকের পথ। সেখানে পৌঁছবার পর আমি নেমে পড়ে রিক্শাওয়ালাকে একটা টাকা দিলাম।

সে বেশ খুশীই হয়েছে, মনে হলো। অনেকখানি ঝুঁকে সেলাম করলো। তারপর যখন আবার সোজা হলো, তার মুখখানা দেখে আমি দারুণ চমকে উঠলাম।

কেন চমকালাম তা নিজেই জানি না। খুব সাধারণ চেহারার একজন বুড়ো। মুখে অল্প অল্প দাড়ি। খুব একটা খারাপ দেখতেও নয়। তবু চমকে ওঠার কারণ কী! কিছুই বুঝতে পারলাম না। শুধু বুকের মধ্যে শিরশির করতে লাগলো।

ভেতরে এসে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময়েও মনের মধ্যে খচখচানিটা রয়েছে। লোকটার মুখে চোখে তো অস্বাভাবিক কিছু নেই। তবু হঠাৎ ওকে দেখেই আমার গা-টা কেঁপে উঠেছিল কেন ?

জামা কাপড় ছেড়ে, আলো নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ার পর মনে পড়লো। এই রিক্শাওয়ালাটার সঙ্গে আর একটা লোকের দারুণ মিল আছে।

বছর দেড়েক আগে সমস্তিপুর থেকে ফিরছিলাম একবার। একাই। স্টেশনে হকারদের কাছ থেকে ছুটো ডিম সেদ্ধ আর তিন পাতা আলুর দম খেয়েছিলাম। ট্রেন ছাড়ার আধঘণ্টার মধ্যেই আমার অসম্ভব পেট ব্যথা শুরু হলো। তিনবার বমি করলাম। কিছুতেই পেট ব্যথা কমে না। বাথরুমের বাইরে দরজার কাছে মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম একবার—মনে হলো আমার কলেরা হয়েছে, আমি এক্ষুণি মরে যাবো।

হয়তো মরেই যেতাম। সেই সময় ভিড় ঠেলেঠুলে একজন বিহারী ভদ্রলোক এসে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? দেখি, জিভ দেখি আপনার—

ভদ্রলোক ডাক্তার। সঙ্গে তার ওষুধের বাক্স। তিনি আমাকে পাঁজা কোলা করে তুলে নিয়ে শুইয়ে দিলেন এক জায়গায়। তারপর এমন সেবা করতে লাগলেন যে অনেক নিকট আত্মীয়ও সে রকম পারে না।

তাঁর ওষুধে কিছুক্ষণের মধ্যে আমার পেট ব্যথা কমে গেল। আর একটা ওষুধে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

কিন্তু সেই ডাক্তার ভদ্রলোককে আমি কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ পাই নি। ঘুম ভাঙার পর আর দেখতে পাইনি তাঁকে। অন্য লোকজনের মুখে শুনলাম তিনি বারাউনিতে নেমে গেছেন। দারুণ আপসোস হয়েছিল। আমার সেই উপকারী বন্ধুর নামটাও জানতে পারি নি। মুখটা অবশ্য মনে আছে। মধ্যবয়স্ক লোক। মুখে অল্প অল্প দাড়ি। অবিকল আজকের রিক্শাওয়ালার মতন। এ কখনো হয়? মানুষে মানুষে এত মিল থাকে; যমজ ভাই হলে অনেক সময় হতেও পারে। কিন্তু একজন ডাক্তার আর একজন রিক্শাওয়ালা? সেই ডাক্তারই কোনো রকম ভাগ্য বিপর্যয়ে রিক্শাওয়ালা হয়েছে? তাহলে তো আমার উচিত ব্যাপারটার খোঁজ করা। কিম্বা যদি সেই ডাক্তারের ভাইও—হয়—!

পরদিন পায়ে এমন ব্যথা হলো যে বাড়ি থেকে বেরুতেই

পারলাম না। আমার ছোট ভাই-ই ডাক্তার। সে আমার হাঁটাচলা একদম বন্ধ করে দিল। সাতদিন পরে বাড়ি থেকে বেরিয়েই সেই রিক্‌শাওয়ালার খোঁজ করেছিলাম। পেলাম না। অন্য দু' একজন রিক্‌শাওয়ালাকে তার কথা জিজ্ঞেস করেও কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশ্য এত সামান্য বর্ণনায় কোনো মানুষকে খুঁজে বার করাও যায় না। মধ্যবয়স্ক এবং মুখে সামান্য দাড়িওয়ালা আরও দু'তিনজন বিহারী রিক্‌শাওয়ালা আছে। কিন্তু কেউই সেই লোকটি নয়। হতে পারে। সেই রিক্‌শাওয়ালা অন্য পাড়ার। সেদিনই শুধু এদিকে এসে পড়েছিল।

তবু মনের মধ্যে একটা খটকা রয়ে গেল। আমার দু দু'বার বিপদের সময় ঠিক একই রকম চেহারায় দু'জন লোক আমাকে সাহায্য করার জন্য এসে উপস্থিত হয়েছিল! এ কেমন করে হয়।

বন্ধুবান্ধবদের বললাম ঘটনাটা। তারা হেসে উড়িয়ে দিল। কয়েক-জন নানারকম ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলো। মাঝ রাত্তিরের অন্ধকারে-আমি রিক্‌শাওয়ালার মুখ ভালো করে দেখতে পাইনি। আমার অচেতন মনে নাকি সেই সময়েই সেই ডাক্তারটির কথা ঘুরছিল। সেই জন্যই নাকি আমি রিক্‌শাওয়ালার মুখখানা সেই ডাক্তারের মতন কল্পনা করে নিয়েছি! কি জানি হতেও পারে!

এর ঠিক বছর দেড়েক বাদে আর একটা ঘটনা ঘটলো। সেদিন আমি যাচ্ছিলাম ট্যাক্‌সি করে। আমার সঙ্গে অনেক কাগজ পত্র। খুব মন দিয়ে আমি কয়েকটা চিঠিপত্র পড়ছিলাম—এবং যেগুলো অপ্রয়োজনীয় সেগুলো ফেলে দিচ্ছিলাম জানালা দিয়ে। এক সময় দেখলাম, ঠিক আমার জানালার পাশেই একটা ট্যাক্‌সি জোরে হর্ণ দিচ্ছে এবং পেছনের সীট থেকে একজন লোক হাত পা নেড়ে আমাকে কী যেন বলতে চাইছে। লোকটির মুখে খুব একটা ব্যস্ত ভাব। আমি আমার ট্যাক্‌সি ড্রাইভারকে বললাম রোখকে রোখকে!

পাশাপাশি দুটো ট্যাক্‌সিই দাঁড়িয়ে গেল। অন্য ট্যাক্‌সির

একজন বাঙালী ভদ্রলোক আমাকে বললেন, আপনার চিঠিপত্র যে সব উড়ে যাচ্ছে! আমি দুটো কুড়িয়ে এনেছি—

আমি অবহেলার সঙ্গে বললাম, ওগুলো তো আমি ফেলে দিয়েছি! কেন মিছিমিছি আপনি তুলতে গেলেন?

পরক্ষণেই মনে হলো, যাই হোক ভদ্রলোক এরকম কষ্ট করেছেন যখন, ওঁকে একটা ধন্যবাদ জানানো উচিত অন্তত!

কিন্তু ধন্যবাদ জানাবার আগেই দুটি ব্যাপারে আমাকে চমকে উঠতে হলো। আমার ট্যাক্সিটা থেমে পড়ায় পেছনের গাড়িটা ওভারটেক করে এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা মিনিবাসের সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কা মারলো। এত জোর অ্যাক্সিডেন্ট যে আওয়াজে প্রথমে কানে তালা লেগে যাবার মতো হলো। এবং সেই মুহূর্তে আমি লক্ষ্য করলাম। আমার পাশের ট্যাকসির ভদ্রলোকের মুখখানা অবিকল সেই ট্রেনের ডাক্তার কিংবা মাঝ রাত্তিরের রিক্শা-ওয়ালার মতন।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়লাম। এখন ঠিক বিকেল, এখন তো চোখের ভুল হবার কথা নয়!

সামনের অ্যাক্সিডেন্ট দেখতে বহুলোক ছুটে যাচ্ছে। গাড়িটার ক্ষতিই হয়েছে বেশী পেছনের দু'জন যাত্রীর অবস্থা সঙ্গীন। দৃঢ় ধারণা হলো, আমার ট্যাক্সিটা যদি এভাবে না থামাতো, তাহলে এটা নিশ্চয়ই অ্যাক্সিডেন্ট করতো এবং এতক্ষণে আমার ছিন্নভিন্ন শরীর পড়ে থাকতো রাস্তায়। এই ভদ্রলোকই আমাকে বাঁচিয়েছেন।

আমি অন্য ট্যাক্সির জানালার ধারে গিয়ে বললাম। আপনি আমার আজ যে কী উপকার করলেন তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না! কী বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো।

ভদ্রলোক সামনের অ্যাক্সিডেন্টটা দেখে একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। ফিসফিস করে বললেন, ওরেঃ বাবা! কী সাংঘাতিক অ্যাক্সিডেন্ট! কেউ মারা গেছেন নিশ্চয়ই!

এই সুযোগে আমি ভদ্রলোককে ভালো করে দেখে নিলাম।

মধ্যবয়স্ক, মুখে অল্প দাড়ি। খুব লম্বা কিম্বা বেঁটে নন। সব কিছু সেই ট্রেনের ডাক্তারটির মতন এক রকম।

আমি বলালাম, আপনি এখানে একটু নামবেন?

উনি বললেন, আমার বিশেষ জরুরী কাজ ছিল—

—কিন্তু এখন তো যেতে পারবেন না। রাস্তা জ্যাম হয়ে গেছে।

—তাই তো কি যে করি!

ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে উনি নেমে পড়লেন। আমি বললাম, আজ আপনিই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন!

উনি লজ্জিত ভাবে বললেন না, না, আমি আবার কী করলাম! আপনার চিঠিগুলো উড়ে উড়ে পড়ছিল। যদি কাজের জিনিস হয়, আপনি হয়তো লক্ষ্য করেন নি।

- কিন্তু আপনি ঐ জন্য আমার ট্যাক্সিটা না থামালে আমিই ঐ অ্যাক্সিডেন্টে পড়তাম নির্ঘাত।

—কলকাতার রাস্তায় কখন যে কার অ্যাক্সিডেন্ট হবে তা বলা যায় না!

সামনেই গাড়ি থেকে তখন একটা মৃতদেহ নামানো হচ্ছে। ভদ্রলোক মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, ইস, এইসব দৃশ্য আমি একদম দেখতে পারি না!

আমি বললাম, চলুন, কোন দোকানে বসে একটু চা খাই।

উনি বললেন, আমায় বড় জরুরী কাজ ছিল—কিন্তু কী আর হবে!

আমার অনুরোধে ভদ্রলোক রাজি হয়ে গেলেন। আমি তখন কৌতূহলে ছটফট করছি। ভদ্রলোককে বাঙালী বলেই মনে হচ্ছে। যদিও অনেক বিহারী পরিষ্কার বাংলা বলতে পারেন।

নিজের নামটা বলে, ওঁকে নাম জিজ্ঞেস করলাম।

উনি বললেন, আমার নাম কৃষ্ণচন্দ্র হালদার।

খাঁটি বাংলা নাম। তবু চেহারার এত অসম্ভব মিল কী করে হয়? রিক্শাওয়ালাকে আমি ভালো করে না দেখলেও ট্রেনের সেই ডাক্তারের চেহারা আমার স্পষ্ট মনে আছে। হুবহু এই রকম।

—আপনি কি ডাক্তার ?

—না তো !

—আপনি কি সমস্তিপুরের দিকে কখনো গিয়েছিলেন ?

—সমস্তিপুর ? না যাইনি কখনও !

ভদ্রলোক রীতিমতন অবাক হয়ে তাকালেন আমার দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন একথা জিজ্ঞেস করলেন কেন ?

—ঠিক অবিকল আপনার মতন চেহারার একজন লোককে আমি আগে দেখেছি। একজন নয় দু'জন।

কৃষ্ণচন্দ্র হালদার হাসতে আরম্ভ করলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, সে কি মশাই। ঠিক আমার মতন চেহারা ? তা হয় নাকি !

—আপনার কোনো ভাইটাই।

—আমার তো কোনো ভাই নেই।

কিছুতেই কিছু মিলছে না। অথচ আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ঠিক এই রকম চেহারার দু'জন লোককে আমি দেখেছি। প্রত্যেকবারই আমার কোনো বিপদের সময়।

কাছাকাছি একটা চায়ের দোকানে ঢুকলাম। ট্রেনের সেই ডাক্তারটিকে আমি কিছুই শোধ দিতে পারিনি। এই ভদ্রলোকও আমাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন। এঁকে কিছুটা অন্তত খাতির করা উচিত।

—কী খাবেন বলুন ?

ভদ্রলোক কিছুই খেতে চান না। শুধু এক কাপ চা। তা হয় না। আমি শেষ পর্যন্ত দু'প্লেট স্যাণ্ডউইচ আর চায়ের অর্ডার দিলাম

ভদ্রলোক বললেন, উঃ এই রকম সাংঘাতিক অ্যাক্‌সিডেন্ট, এখনো আমার শরীরটা কাঁপছে !

—এ অ্যাক্‌সিডেন্টে আমার মরার কথা ছিল।

—বলবেন না মশাই, ও কথা বলবেন না। আমি এই দৃশ্য একদম সইতে পারি না !

আমি পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করলাম। একটি মাত্র সিগারেট।

সেটাই বাড়িয়ে দিলাম ভদ্রলোকের দিকে। তিনি নিতে গিয়েও হাত সরিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, একটা রয়েছে। আপনার ?

—আবার আনিয়ে নিচ্ছি।

—দাঁড়ান, আমি সিগারেট কিনে আনছি।

—না, না, আপনি বসুন, আমি আনাচ্ছি।

—আমার নিজেরই কেনা দরকার! অনেকক্ষণ ফুরিয়ে গেছে।

—বেয়ারাকে পাঠালেই তো—

ভদ্রলোক সে কথা শুনলেন না। নিজেই সিগারেট কিনতে বেরিয়ে গেলেন। আমি আমার হাতের কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রাখতে লাগলাম। ভাগ্যিস বাজে চিঠিগুলো জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলাম।

বেয়ারা এসে চা আর স্যাণ্ডউইচ রেখে গেল। ভদ্রলোক তো সিগারেট কিনে ফিরলেন না। দোকানের পাশেই তো সিগারেটের দোকান। হয়তো টাকার খুচরো পাচ্ছেন না।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। ভদ্রলোক এলেন না। এত দেরী হবার তো কোনো কথাই নয়। উঠে গিয়ে দরজার বাইরে উঁকি দিলাম। সিগারেটের দোকানের সামনে সেই ভদ্রলোক নেই।

সেখানে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মুখে দাড়িওয়ালা একজন লোক এসেছিলেন একটু আগে।

দোকানদার বললো, না তো!

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ভদ্রলোককে আর পাওয়া গেল না। সেই দু'প্লেট স্যাণ্ডউইচ আর চা আমাকে একলাই শেষ করতে হলো।

ভদ্রলোক চলে গেলেন কেন? হয়তো খুব জরুরী কোনো কাজের কথা মনে পড়ে গেছে। জরুরী কাজের কথা তো বলছিলেনই। কাজেই আর একটা ট্যাক্সি পেয়ে উঠে পড়েছেন।

কিন্তু আমাকে একবার বলেও গেলেন না?

মনের মধ্যে খটকাটা রয়েই গেল।



অভিশপ্ত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার জীবনে সেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার সেবার ঘটেছিল।

বছর তিনেক আগেকার কথা। আমাকে বরিশালের ওধারে যেতে হয়েছিল একটা কাজে।

ও অঞ্চলের একটা গঞ্জ থেকে বেলা প্রায় বারোটার সময় নৌকোয় উঠলুম। আমার সঙ্গে এক নৌকোয় বরিশালের এক ভদ্রলোক ছিলেন। গল্পে-গুজবে সময় কাটতে লাগল।

সময়টা পুজোর পরেই। দিনমানটা মেঘলা মেঘলা কেটে গেল। মাঝেমাঝে টিপ-টিপ করে বৃষ্টিও পড়তে শুরু হল। সন্ধ্যার কিছু আগে কিন্তু আকাশটা অল্প-পরিষ্কার হয়ে গেল। ভাঙা-ভাঙা মেঘের মধ্যে দিয়ে চতুর্দশীর চাঁদের আলো অল্প-অল্প প্রকাশ হল।

সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বড় নদী ছেড়ে একটা খালে পড়লুম—শোনা গেল খালটা এখান থেকে আরম্ভ করে নোয়াখালির উত্তর দিয়ে একেবারে মেঘনায় মিশেছে। পূর্ববঙ্গে সেই আমার নতুন যাওয়া, চোখে কেমন সব একটু নতুন ঠেকতে লাগল। অপরিসর খালের দু-ধারে বৃষ্টিস্নাত কেয়ার জঙ্গলে মেঘে আধো ঢাকা চতুর্দশীর জ্যোৎস্না চিকমিক করছিল। মাঝে মাঝে নদীর ধারে বড়-বড় মাঠ। শটি, বেত, ফার্ন গাছের বন জায়গায় জায়গায় খালের জলে ঝুঁকে পড়েছে।···বাইরে একটু ঠাণ্ডা থাকলেও আমি ছইয়ের বাইরে বসে দেখতে দেখতে যাচ্ছিলুম।····বরিশালের সে অংশটা সুন্দরবনের কাছাকাছি। ছোট ছোট খাল ও নদী চারিধারে, সমুদ্র খুব দূরে নয়, দশ পনেরো মাইল

ক্ষিণ-পশ্চিমেই হাতিয়া ও সন্দ্বীপ। আর একটু রাত হল। খালের ়-পাড়ের নির্জন জঙ্গল অস্ফুট জ্যোৎস্নায় কেমন যেন অদ্ভুত দেখাতে াগল। এ অংশে লোকের বসতি একেবারে নেই, শুধু ঘন বন আর লের ধারে বড়-বড় হোগলা গাছ।

আমার সঙ্গী বললেন—এত রাতে আর বাইরে থাকবেন না, আসুন ইয়ের মধ্যে। এসব জঙ্গলে···বুঝলেন না?

তারপর তিনি সুন্দরবনের নানা গল্প করতে লাগলেন। তাঁর এক াকা নাকি ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন, তাঁরই লঞ্চে করে তিনি কবার সুন্দরবনের নানা অংশে বেড়িয়েছিলেন, সেইসব গল্প।

রাত প্রায় বারোটার কাছাকাছি হল।

মাঝি আমাদের নৌকায় ছিল মোটে একটি। সে বলে উঠল—াবু, একটু এগিয়ে বড় নদী পড়বে। এত রাতে একা সে নদীতে পাড়ি মাতে পারব না। এখানেই নৌকো রাখি।

নৌকো সেদিকে বাঁধা হল। এদিকে বড়-বড় গাছের আড়ালে চাঁদ স্ত গেল, দেখলুম অপ্রশস্ত খালের দু-ধারেই অন্ধকার-ঢাকা ঘন জঙ্গল। ারিদিকে কোন শব্দ নেই, পতঙ্গগুলো পর্যন্ত চুপ করেছে। সঙ্গীকে ললুম—মশায়, এই তো সরু খাল—পাড় থেকে বাঘ লাফিয়ে পড়বে না া নৌকোর ওপর?

সঙ্গী বললেন—না পড়লেই আশ্চর্য হব!

শুনে অত্যন্ত পুলকে ছইয়ের মধ্যে ঘেঁসে বসলুম। খানিকটা বসে াকবার পর সঙ্গী বললেন—আসুন একটু শোয়া যাক। ঘুম তো হবে া, আর ঘুমোনো ঠিকও না, আসুন একটু চোখ বুজে থাকি।

খানিকটা চুপ করে থাকবার পর সঙ্গীকে ডাকতে গিয়ে দেখি তিনি ুমিয়ে পড়েছেন, মাঝিও জেগে আছে বলে মনে হল না; ভাবলুম, তবে ামিই বা কেন মিথ্যে-মিথ্যে চোখ চেয়ে থাকি—মহাজনদের পথ ধরবার ্যোগ করলুম।

তারপর যা ঘটল সে আমার জীবনের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। শুতে াচ্ছি, হঠাৎ আমার কানে গেল অন্ধকার বন-ঝোপের ওপাশে অনেক

দূরে গভীর জলের মধ্যে কে যেন কোথায় গ্রামোফোন বাজাচ্ছে।··· তাড়াতাড়ি উঠে বসলুম। গ্রামোফোন ? এ বনে এত রাত্রে গ্রামোফোন বাজাবে কী ? কান পেতে শুনলাম, গ্রামোফোন না। অন্ধকারে হিজল হিন্তাল গাছগুলো যেখানে খুব ঘন হয়ে আছে, সেখান থেকে কারা যেন উচ্চ কণ্ঠে আর্ত করুণ সুরে কি বলছে।···খানিকটা শুনে মনে হল সেটা একাধিক লোকের সমবেত কণ্ঠস্বর। প্রতিবেশীর তেতলার ছাদে গ্রামফোন বাজলে যেমন খানিকটা স্পষ্ট খানিকটা অস্পষ্ট অথচ বেশ একটা একটানা সুরের ঢেউ এসে কানে পৌঁছয়—এও অনেকটা সেই ভাবের। মনে হল যেন কতকগুলো অস্পষ্ট বাংলা ভাষার শব্দও কানে এল—কিন্তু ধরতে পারা গেল না কথাগুলো কী। শব্দটা মাত্র মিনিট-খানেক স্থায়ী হল, তারপরই অন্ধকার বনভূমি যেমন নিস্তব্ধ ছিল আবার তেমনি নিস্তব্ধ হয়ে গেল···তাড়াতাড়ি ছইয়ের বাইরে এলুম। চারিপাশের অন্ধকার ঝিঙের বিচির মতন কালো। বনভূমি নীরব, শুধু নৌকোর তলায় ভাঁটার জল কলকল করে বাধছে, আর শেষ রাত্রের বাতাসে জলের ধারে কেয়াঝোপে একপ্রকার অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। পাড় থেকে দূরে হিজল গাছের কালো গুঁড়িগুলোর অন্ধকারে এক অদ্ভুত চেহারা হয়েছে।

ভাবলুম সঙ্গীদের ডেকে তুলি। আবার ভাবলুম বেচারিরা ঘুমুচ্ছে, ডেকে কী হবে, তার চেয়ে বরং নিজে জেগে বসে থাকি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালুম, তারপর আবার ছইয়ের মধ্যে ঢুকতে যাব, এমন সময় সেই অন্ধকারে ঢাকা বিশাল বনভূমির কোন অংশ থেকে সুস্পষ্ট উচ্চ আর্ত করুণ ঝিঁঝিঁপোকার রবের মত তীক্ষ্ণ স্বর তীরের মতন জমাট অন্ধকারের বুক চিরে আকাশে উঠল—ওগো নৌকোযাত্রীরা, তোমরা কারা যাচ্ছ···আমাদের ওঠাও ওঠাও···আমাদের বাঁচাও !

নৌকোর মাঝিরা ধড়মড় করে জেগে উঠল। আমি সঙ্গীকে ডাকলুম—মশায়, ও মশায় উঠুন উঠুন !

মাঝি আমার কাছে ঘেঁসে এল, ভয়ে তার গলার স্বর কাঁপছিল বললে—আল্লা ! আল্লা ! শুনতে পেয়েছেন বাবু ?

সঙ্গী উঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কী, কী মশায়? ডাকলেন কেন? কোন জানোয়ার-টানোয়ার নাকি?

আমি ব্যাপারটা বললুম। তিনিও তাড়াতাড়ি ছইয়ের বাইরে এলেন।

তিনজনে মিলে কান খাড়া করে রইলুম। চারিদিক আবার চুপ… ভাঁটার জল নৌকোর তলায় বেধে আগের চেয়েও জোরে শব্দ হচ্ছিল।…

সঙ্গী মাঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন—এটা কি তবে—

মাঝি বললে—হ্যাঁ বাবু। বাঁয়েই কীর্তিপাশার গড়।

সঙ্গী বললেন—তবে তুই এত রাত্রে এখানে নৌকো রাখলি কেন? বেকুব কোথাকার!

মাঝি বললে—তিনজন আছি বলেই রেখেছিলাম বাবু! ভাঁটার টানে নৌকো পিছেয়ে নেবার জো ছিল না!

কথাবার্তার ধরন শুনে সঙ্গীকে বললুম—কি মশায়, কি ব্যাপার? আপনি কিছু জানেন নাকি?

ভয়ে যত না হোক বিস্ময়ে আমরা কেমন হয়ে গিয়েছিলুম। সঙ্গী বললেন—ওরে তোর সেই কেরাসিনের ডিবেটা জ্বাল্। আলো জ্বেলে বসে থাকা যাক—রাত এখনও ঢের।

মাঝিকে বললুম—তুই শব্দটা শুনতে পেয়েছিলি?

সে বললে—হ্যাঁ বাবু, আওয়াজ কানে গিয়েই তো আমার ঘুম ভেঙে গেল! আমি আরও দু-বার নৌকো বেয়ে যেতে ও ডাক শুনেছি।

সঙ্গী বললেন—এটা এ অঞ্চলের একটা অদ্ভুত ঘটনা। তবে এ জায়গাটা সুন্দরবনের সীমানায় বলে আর এ অঞ্চলে কোন লোকালয় নেই বলে, শুধু নৌকোর মাঝিদের কাছেই এটা সুপরিচিত। এর পেছনে একটা ইতিহাস আছে সেটা অবশ্য নৌকোর মাঝিদের পরিচিত নয়—সেইটে আপনাকে বলি শুনুন।

তারপর ধূমায়িত কেরোসিনের ডিবার আলোয় অন্ধকার বনের বুকের মধ্যে বসে সঙ্গীর মুখে কীর্তিপাশার গড়ের ইতিহাসটা শুনতে লাগলুম।

* * * *

তিনশো বছর আগেকার কথা। মুনিম খাঁ তখন গৌড়ের সুবাদার।

এ অঞ্চলে তখন বারোভুইয়ার দুই প্রতাপশালী ভুইয়া রাজা রামচন্দ্র রায় ও ইশা খাঁ। মসনদ-ই আলির খুব প্রতাপ। মেঘনার মোহনার বাইরে সমুদ্র, যাকে এখন সন্দীপ চ্যানেল বলে, সেখানে তখন মগ আর পোর্তুগীজ জলদস্যুরা শিকারান্বেষণে শ্যেনপক্ষীর মত ওৎ পেতে বসে থাকত। সে সময় এখানে এরকম বন জঙ্গল ছিল না। এ সমস্ত জায়গা তখন কীর্তি রায়ের অধিকারে ছিল। এইখানে তাঁর সুদৃঢ় দুর্গ ছিল—মগ জলদস্যুদের সঙ্গে তিনি অনেকবার লড়েছিলেন। তাঁর অধীনে সৈন্যসামন্ত, কামান, যুদ্ধের কোশা সবই ছিল। সন্দীপ তখন ছিল পোর্তুগীজ জলদস্যুদের প্রধান আড্ডা। এদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে এ অঞ্চলের সকল জমিদারকেই সৈন্যবল দৃঢ় করে গড়তে হত। এ বনের পশ্চিম ধার দিয়ে তখন আর-একটা খাল বড় নদীতে পড়ত বনের মধ্যে তার চিহ্ন এখনও আছে। কীর্তি রায় অত্যন্ত অত্যাচারী এবং দুর্ধর্ষ জমিদার ছিলেন। তাঁর রাজ্যে এমন সুন্দর মেয়ে কমই ছিল যে তাঁর অন্তঃপুরে একবার না একবার ঢুকেছে। তাছাড়া তিনি নিজেও একপ্রকার জলদস্যু ছিলেন। তাঁর নিজের অনেকগুলো বড় ছিপ ছিল। আশপাশের জমিদারির মধ্যেও সম্পত্তিশালী গৃহস্থের ধনরত্ন স্ত্রী কন্যা লুটপাট করা রূপ মহৎ কার্যে সেগুলি ব্যবহৃত হত। কীর্তি রায়ের পাশের জমিদারি ছিল কীর্তি রায়ের এক বন্ধুর। এঁরা ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্র রায়েদের পত্তনিদার। অবশ্য সে সময় অনেক পত্তনিদারের ক্ষমতা এখনকার স্বাধীন রাজাদের চেয়ে বেশি ছিল। কীর্তি রায়ের বন্ধু মারা গেলে তাঁর তরুণ-বয়স্ক পুত্র নরনারায়ণ রায় পিতার জমিদারির ভার পান। নরনারায়ণ রায় তখন সবে যৌবনে পদার্পণ করেছেন, অত্যন্ত সুপুরুষ, বীর ও শক্তিমান। নরনারায়ণ কীর্তি রায়ের পুত্র চঞ্চল রায়ের সমবয়সী ও বন্ধু। সেবার কীর্তি রায়ের নিমন্ত্রণে নরনারায়ণ রায় তাঁর রাজ্যে দিন-কতকের জন্যে বেড়াতে এলেন। চঞ্চল রায়ের তরুণী পত্নী লক্ষ্মী দেবী স্বামীর বন্ধু নরনারায়ণকে দেবরের মত স্নেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন। দু-এক দিনের মধ্যেই কিন্তু সে স্নেহের

হলেও একটু গম্ভীর প্রকৃতির। বিদ্যুৎচঞ্চলা তরুণী বন্ধুপত্নীর ব্যঙ্গ পরিহাসে গম্ভীরপ্রকৃতি নরনরায়ণের মান বাঁচিয়ে চলা দুষ্কর হয়ে পড়ল। স্নান করে উঠছেন, মাথার তাজ খুঁজে পাওয়া যায় না। নানা জায়গায় খুঁজে হয়রান হয়ে তার আশা ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন, হঠাৎ কখন নিজের বালিশ তুলতে গিয়ে দেখেন তার নিচেই তাজ চাপা আছে। যদিও এর আগেও তিনি বালিশের নিচে খুজেছেন। তাঁর প্রিয় তরবারিখানা দুপুর থেকে বিকেলের মধ্যে পাঁচ বার হারিয়ে গেল, আবার পাঁচ বারই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থান থেকে খুঁজে পাওয়া গেল। তাম্বুলে এমন সব দ্রব্যের সমাবেশ হতে লাগল, যা কোনকালেই তাম্বুলের উপকরণ নয়। তরলমস্তিষ্ক বন্ধুপত্নীকে কিছুতেই এঁটে উঠতে না পেরে অত্যাচারজর্জরিত নারায়ণ রায় ঠিক করলেন, তাঁর বন্ধুর স্ত্রীটি ছিটগ্রস্ত। বন্ধুর দুর্দশায় চঞ্চল রায় মনে মনে খুব খুশি হলেও বাইরে স্ত্রীকে বললেন —দু-দিনের জন্যে এসেছে বেচারি, ওকে তুমি যেরকম বিব্রত করে তুলেছ, ও আর কখনও এখানে আসবে না।

দিনকয়েক এরকমে কাটার পর কীর্তি রায়ের আদেশে চঞ্চল রায়কে কি কাজে হঠাৎ গৌড়ে যাত্রা করতে হল। নরনারায়ণ রায়ও, বন্ধুপত্নী কখন কী করে বসে সেই ভয়ে দিনকতক সশঙ্ক অবস্থায় কালযাপন করবার পর নিজের বজরায় উঠে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। যাবার সময় লক্ষ্মীদেবী বলে দিলেন—এবার আবার যখন আসবে ভাই, এমন একটি বিশ্বাসী লোক সঙ্গে এনো যে রাত দিন তোমার জিনিসপত্র ঘরে বসে চৌকি দেবে—বুঝলে তো?

নরনারায়ণ রায়ের বজরা রায়মঙ্গলের মোহনা ছাড়িয়ে যাবার একটু পরেই জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হল। তখন মধ্যাহ্নকাল, প্রখর রৌদ্রে বজরার দক্ষিণ দিকের দিগ্বলয়-প্রসারী জলরাশি শানানো তলোয়ারের মত ঝক-ঝক করছিল, সমুদ্রের সে অংশে এমন কোন নৌকো ছিল না যারা সাহায্য করতে পারে। সেটা রায়মঙ্গল আর কালাবদর নদীর মুখ, সামনেই বার সমুদ্র—সন্দ্বীপ চ্যানেল, জলদস্যুদের প্রধান ঘাঁটি। [illegible] হল।

নিজে নরনারায়ণ দস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে উরুদেশে কিসের খোঁচা খেয়ে সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়লেন।

জ্ঞান হলে দেখতে পেলেন তিনি এক অন্ধকার স্থানে শুয়ে আছেন, তাঁর সামনে কি যেন একটা বড় নক্ষত্রের মতন জ্বলছে। খানিকক্ষণ জোরে চোখের পলক ফেলবার পর তিনি বুঝলেন, যাকে নক্ষত্র বলে মনে হয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষে একটি অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে আগত দিবালোক। নরনারায়ণ দেখলেন তিনি একটি অন্ধকার কক্ষের আর্দ্র মেঝের ওপর শুয়ে আছেন, ঘরের দেওয়ালের স্থানে স্থানে শ্যাওলার দল গজিয়েছে।

আরো ক-দিন আরো ক-রাত কেটে গেল। কেউ তাঁর জন্যে কোন খাদ্য আনলে না। তিনি বুঝলেন, যারা তাঁকে এখানে এনেছে, তাঁকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলাই তাদের উদ্দেশ্য। মৃত্যু! সামনে নির্মম মৃত্যু!

সে দিনমানও কেটে গেল। আঘাত-জনিত ব্যথায় এবং ক্ষুধাতৃষ্ণায় অবসন্নদেহ নরনারায়ণের চোখের সামনে থেকে গবাক্ষপথের শেষ দিবালোকও মিলিয়ে গেল।···তিনি অন্ধকার ঘরের পাষাণ-শয্যায় ক্ষুধাকাতর দেহ প্রসারিত করে অধীরভাবে মৃত্যুর অপেক্ষা করতে লাগলেন।···প্রকৃতির একটা ক্লোরোফর্ম আছে, যন্ত্রণা পেয়ে মরছে এমন প্রাণীকে মৃত্যু-যন্ত্রণা থেকে বাঁচবার জন্যে সেটা মুমূর্ষু প্রাণীকে অভিভূত করে। ধীরে ধীরে যেন সেই দয়াময়ী মৃতু-তন্দ্রা এসে তাঁকেও আশ্রয় করলে।

অনেকক্ষণ পরে, কতক্ষণ পরে তা তিনি বুঝতে পারলেন না, হঠাৎ আলো চোখে লেগে তাঁর তন্দ্রাঘোর কেটে গেল। বিস্মিত নরনারায়ণ চোখ মেলে দেখলেন, তাঁর সামনে প্রদীপ হস্তে দাঁড়িয়ে তাঁর বন্ধুপত্নী লক্ষ্মী দেবী। কথা বলতে গিয়ে লক্ষ্মী দেবীর ইঙ্গিতে নরনারায়ণ থেমে গেলেন। লক্ষ্মী দেবী হাতের প্রদীপটি আঁচল দিয়ে ঢেকে নরনারায়ণকে তাঁর অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করলেন। একবার নরনারায়ণের সন্দেহ হল—এসব স্বপ্ন নয় তো? কিন্তু ঐ যে দীপশিখার উজ্জ্বল আলোয় আর্দ্র ভিত্তিগাত্রের সবুজ শেওলার দল স্পষ্ট দেখা যায়!···

নরনারায়ণ শক্তিমান যুবক, ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে পড়লেও নিশ্চিত মৃত্যুর গ্রাস থেকে বাঁচবার উৎসাহে তিনি দৃঢ়পদে অগ্রবর্তিনী ক্ষিপ্রগামী বন্ধুপত্নীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চললেন। একটা বক্রগতি পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে একটি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পার হবার পর তিনি দেখলেন যে তাঁরা কীর্তি রায়ের প্রাসাদের সামনের খালধারে এসে পৌঁছেছেন। লক্ষ্মী দেবী একটা ছোট বেতে-বোনা থলি বার করে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন—এতে খাবার আছে, এখানে খেও না। তুমি সাঁতার জান, খাল পার হয়ে ওপারে গিয়ে কিছু খেয়ে নাও, তারপর যত শিগগির পার পালিয়ে যাও :

ব্যাপার কি, নরনারায়ণ রায় একটু একটু করে বুঝলেন। তাঁর বিস্তৃত জমিদারি কীর্তি রায়ের জমিদারির পাশেই, এবং তাঁর অবর্তমানে কীর্তি রায়ই দনুজমর্দনদেবের বংশধরদের ভবিষ্যৎ পত্তনিদার। অত বড় বিস্তৃত ভূসম্পত্তি সৈন্য সামন্ত কীর্তি রায়ের হাতে এলে তিনি কি আর কিছু গ্রাহ্য করবেন? কীর্তি রায় যে মাথা নিচু করে আছেন, তার এই কি কারণ নয় যে, তাঁর এক পাশে বাকলা, চন্দ্রদ্বীপ—অন্য পাশে ভুলুয়ার প্রতাপশালী ভুঁইয়া রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য!

প্রদীপের আলোয় নরনারায়ণ দেখলেন, তাঁর বন্ধুপত্নীর মুখে সে চটুল হাস্যরেখার চিহ্নও নেই, তাঁর মুখখানি সহানুভূতিতে ভরা মাতৃ-মুখের মতন স্নেহকোমল হয়ে এসেছে। তাঁদের চারিপাশে গাঢ় অন্ধকার, মাথার ওপরে আকাশের বুক চিরে দিগন্তবিস্তৃত উজ্জ্বল ছায়াপথ, নিকটেই খালের জল জোর ভাঁটার টানে তীরের হোগলা গাছ দুলিয়ে কল-কল শব্দে বড় নদীর দিকে ছুটছে। নরনারায়ণ আবেগপূর্ণ সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—বৌ-ঠাকরুন, চঞ্চলও কি এর মধ্যে আছে?

লক্ষ্মী দেবী বললেন—না ভাই তিনি কিছু জানেন না। এসব শ্বশুর-ঠাকুরের কীর্তি। এ জন্যেই তাঁকে অন্য জায়গায় পাঠিয়েছেন, এখন আবার মনে হচ্ছে গৌড়-টৌড় সব মিথ্যে।

নরনারায়ণ দেখলেন, লজ্জায় দুঃখে তাঁর বন্ধুপত্নীর মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। লক্ষ্মী দেবী আবার বললেন—আমি আজ জানতে পারি।

খিড়কি-গড়ের পাইক সর্দার আমায় মা বলে, তাকে দিয়ে দুপুর রাতের পাহারা সব সরিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। তাই……

নরনারায়ণ বললেন—বৌ-ঠাকরুন, আমার এক বোন ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিল—তুমি আমার সেই বোন, আজ আবার ফিরে এলে!

লক্ষ্মী দেবীর পদ্মের মতন মুখখানি চোখের জলে ভেসে গেল। একটু ইতস্তত করে বললেন—ভাই, বলতে সাহস পাই নে, তবুও একটা কথা বলছি—বোন বলে যদি রাখ···

নরনারায়ণ জিজ্ঞাসা করলেন—কী কথা বৌ-ঠাকরুন?

লক্ষ্মী দেবী বললেন—তুমি আমার কাছে বলে যাও ভাই যে শ্বশুর-ঠাকুরের কোন অনিষ্ট-চিন্তা তুমি করবে না!

নরনারায়ণ রায় একটু কি ভাবলেন, তারপর বললেন—তুমি আমার প্রাণ দিলে বৌ-ঠাকরুন, তোমর কাছে বলে যাচ্ছি—তুমি বেঁচে থাকতে আমি তোমার শ্বশুরের কোন অনিষ্টচিন্তা করব না।

বিদায় নিতে গিয়ে নরনারায়ণ একবার জিজ্ঞাসা করলেন—বৌ-ঠাকরুন. তুমি ফিরে যেতে পারবে তো?

লক্ষ্মী দেবী বললেন—আমি ঠিক যাব, তুমি কিন্তু যতদূর পার সাঁতরে গিয়ে তারপর ডাঙায় উঠে চলে যেও।

নরনারায়ণ রায় সেই ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারে মধ্যে নিঃশব্দে খালের জলে মিলিয়ে গেলেন।

লক্ষ্মী দেবীর প্রদীপটা অনেকক্ষণ বাতাসে নিবে গিয়েছিল—তিনি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে শ্বশুরের গড়ের দিকে ফিরলেন। একটু দূরে গিয়েই তিনি দেখতে পেলেন, পাশের ছোট খালটায় দুখানা ছিপ মশালের আলোয় সজ্জিত হচ্ছে—ভয়ে তাঁর বুকের রক্ত জমে গেল—সর্বনাশ! ওরা কি তবে জানতে পেরেছে? দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে গুপ্ত সুড়ঙ্গের বুকে এসে তিনি দেখলেন, সুড়ঙ্গের পথ খোলাই আছে। তিনি তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

কীর্তি রায় বুঝতেন. নিজের হাতের আঙুলও যদি বিষাক্ত হয়ে উঠে

দিনের আলো ফুটে উঠল, কিন্তু লক্ষ্মী দেবীকে আর কোনদিন কেউ দেখে নি। রাতের হিংস্র অন্ধকার তাঁকে গ্রাস করে ফেলেছিল···

নরনারায়ণ রায় নিজের রাজধানীতে বসে সব শুনলেন—গুপ্ত সুড়ঙ্গের দু ধারে মুখ বন্ধ করে কীর্তি রায় তাঁর পুত্রবধূর শ্বাস রোধ করে তাঁকে হত্যা করেছেন। শুনে তিনি চুপ করে রইলেন।···এর কিছুদিন পরে তাঁর কানে গেল—বাশুণ্ডার লক্ষ্মণ রায়ের মেয়ের সঙ্গে শীঘ্র চঞ্চলের বিয়ে।

সেদিন রাত্রে চাঁদ উঠলে নিজের প্রাসাদ-শিখরে বেড়াতে বেড়াতে চারিদিকের শুভ্র সুন্দর আলোয় সাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করে দৃঢ়চিত্ত নরনারায়ণ রায়েরও চোখের পাতা যেন ভিজে উঠল। তাঁর মনে হল তাঁর অভাগিনী বৌ-ঠাকুরানীর হৃদয়-নিঃসারিত নিষ্পাপ অকলঙ্ক পবিত্র স্নেহের ঢেউয়ে সারা জগৎ ভেসে যাচ্ছে....মনে হল, তাঁরই অন্তরের শ্যামলতায় জ্যোৎস্নাধৌত বন-ভূমির অঙ্গে অঙ্গে শ্যামল সুন্দর শ্রী—নীরব আকাশের তলে তাঁরই চোখের দুষ্ট হাসিটি তারায় তারায় নবমল্লিকার মত ফুটে উঠেছে।···নরনারায়ণ রায়ের আগের পূর্বপুরুষরা ছিলেন দুর্ধর্ষ ভূম্যধিকারী দস্যু—হঠাৎ পূর্বপুরুষের সেই বর্বর রক্ত নরনায়ণের ধমনীতে নেচে উঠল, তিনি মনে মনে বললেন—আমার অপমান আমি ভুলেই গিয়াছিলাম বৌ-ঠাকরুন, কিন্তু তোমার অপমান আমি সহ্য করব না কখনও!

কিছুদিন কেটে গেল। তারপর একদিন এক শীতের ভোররাত্রির কুয়াসা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, কীর্তি রায়ের গড়ের খালের মুখ ছিপে, সুলুপে, জাহাজে ভরে গিয়েছে। তোপের আওয়াজে কীর্তি রায়ের প্রাসাদ-দুর্গের ভিত্তি ঘন-ঘন কেঁপে উঠতে লাগল। কীর্তি রায় শুনলেন, আক্রমণকারী নরনারায়ণ রায়। সঙ্গে দুরন্ত পোর্তুগীজ জলদস্যু সিবাস্টিও গঞ্জালেস। উভয়ের সম্মিলিত বহরের চল্লিশখানা কোশা খালের মুখে চড়াও হয়েছে, পুরো বহরের বাকি অংশ বাহির নদীতে দাঁড়িয়ে।

এ আক্রমণের জন্য কীর্তি রায় পূর্ব থেকে প্রস্তুত ছিলেন—কেবল

রাজা রামচন্দ্র রায় এবং রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের সঙ্গে গঞ্জালেসের কয়েক বৎসর ধরে শত্রুতা চলে আসছে। এ অবস্থায় গঞ্জালেস যে তাঁদের পত্তনিদার নরনারায়ণ রায়ের সঙ্গে যোগ দেবে—এ কীর্তি রায়ের কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তা হলেও কীর্তি রায়ের গড় থেকেও তোপ চলল।

গঞ্জালেস সুদক্ষ নৌবীর। তার পরিচালনে দশখানা সুলুপ চড়া ঘুরে গড়ের পাশের ছোট খালে ঢুকতে গিয়ে কীর্তি রায়ের নওয়ারার এক অংশ দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হল। গড়ের কামান সেদিকে এত প্রখর যে খালের মুখে দাঁড়িয়ে থাকলে বহর মারা পড়ে। গঞ্জালেস দু-খানা কামানবাহী সুলুপ ছোট খালের মুখে রেখে বাকিগুলো সেখান থেকে ঘুরিয়ে এনে চড়ার পিছনে দাঁড় করালে। গঞ্জালেসের অধীনস্থ অন্যতম জলদস্যু মাইকেল রোজারিও ডি ভেগা এই ছোট বহর খালের মধ্যে ঢুকিয়ে গড়ের পশ্চিম দিক আক্রমণ করবার জন্যে আদিষ্ট হল।

অতর্কিত আক্রমণে কীর্তি রায়ের নওয়ারা শত্রুবহর কর্তৃক ছিপি-আঁটা বোতলের মতন খালের মধ্যে আটকে গেল—বার-নদীতে গিয়ে যুদ্ধ দেবার ক্ষমতা তাদের আদৌ রইল না। তবুও তাদের বিক্রমে রোজারিও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কিছু করে উঠতে পারলে না। কীর্তি রায়ের নৌবহর দুর্বল ছিল না। কীর্তি রায়ের গড় থেকে পোর্তুগীজ জলদস্যুদের আড্ডা সন্দীপ খুব দূরে নয়। কাজেই কীর্তি রায়কে নৌবহর সুদৃঢ় করে গড়তে হয়েছিল।

বৈকালের দিকে রোজারিওর কামানের মুখে গড়ের পশ্চিম দিকটা একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। নরনারায়ণ রায় দেখলেন, প্রায় ত্রিশখানা কোশা জখম অবস্থায় খালের মুখে পড়ে, কীর্তি রায়ের গড়ের কামানগুলো সব চুপ, নদীর দু-পাড় ঘিরে সন্ধ্যা নেমে আসছে। উচ্চে নিস্তব্ধ নীল আকাশে কেবলমাত্র একঝাঁক শকুনি কীর্তি রায়ের গড়ের ওপর চক্রাকারে ঘুরছে।—হঠাৎ বিজয়োন্মত্ত নরনারায়ণ রায়ের চোখের সম্মুখে বন্ধুপত্নীর বিদায়ের রাতের সন্ধ্যার পদ্মের মতন বিষাদভরা ম্লান মুখখানি, কাতর মিনতিপূর্ণ সেই চোখদুটি মনে পড়ল—তীব্র অনুশোচনায়

তাঁর মন তখনই ভরে উঠল।—তিনি করেছেন কী! এইরকম করেই কি তিনি তাঁর স্নেহময়ী প্রাণদাত্রীর শেষ অনুরোধ রাখতে এসেছেন?—

নরনারায়ণ রায় হুকুম জারি করলেন—কীর্তি রায়ের পরিবারের এক প্রাণীরও যেন প্রাণহানি না হয়!

একটু পরেই সংবাদ এল, গড়ের মধ্যে কেউ নেই। নরনারায়ণ রায় বিস্মিত হলেন। তিনি তখনই নিজে গড়ের মধ্যে ঢুকলেন। তিনি এবং গঞ্জালেস গড়ের সমস্ত অংশ তন্ন-তন্ন করে খুঁজলেন—দেখলেন সত্যিই কেউ নেই। পোর্তুগীজ বহরের লোকেরা গড়ের মধ্যে লুটপাট করতে গিয়ে দেখলে, মূল্যবান দ্রব্যাদির বড় কিছু নেই। পরদিন দ্বি-প্রহর পর্যন্ত লুটপাট চলল—কীর্তি রায়ের পরিরারের এক প্রাণীরও সন্ধান পাওয়া গেল না। অপরাহ্নে কেবলমাত্র দু-খানা স্লুপ খালের মুখে পাহারা রেখে নরনারায়ণ রায় ফিরে চলে এলেন

এই ঘটনার দিন কতক পরে পোর্তুগীজ জলদস্যুর দল লুটপাট করে চলে গেলে, কীর্তি রায়ের এক কর্মচারী গড়ের মধ্যে প্রবেশ করে। আক্রমণের দিন সকালেই এ লোকটি গড় থেকে আরও অনেকের সঙ্গে পালিয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে একটা বড় থামের আড়ালে সে দেখতে পেলে, একজন আহত মুমূর্ষু লোক তাকে ডেকে কি বলবার চেষ্টা করছে। কাছে গিয়ে সে লোটোকে চিনলে—লোকটি কীর্তি রায়ের পরিবারের এক বিশ্বস্ত পুরনো কর্মচারী। তার মৃত্যুকালীন অস্পষ্ট বাক্যে আগন্তুক কর্মচারীটি মোটামুটি যা বুঝল, তাতেই তার কপাল ঘেমে উঠল। সে বুঝল কীর্তি রায় তাঁর পরিবারবর্গ ও ধনরত্ন নিয়ে মাটির নিচের এক গুপ্ত স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন এবং এই লোকটিই একমাত্র তাঁর সন্ধান জানে। তখনকার আমলে এই গুপ্ত গৃহগুলি প্রায় সকল বাড়িতেই থাকত এবং এর ব্যবস্থা এমন ছিল যে বাইরে থেকে কেউ এগুলো না খুলে দিলে বেরুবার উপায় ছিল না।—কোথায় সে মাটির নিচের ঘর, তা স্পষ্ট করে বলার আগেই আহত লোকটি মারা গেল। বহু অনুসন্ধানেও গড়ের কোন্ অংশে যে গুপ্তস্থান ছিল তা কেউ সন্ধান করতে পারল না।

এইরকমে কীর্তি রায় ও তাঁর পরিবারবর্গ অনাহারে তিলে তিলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গড়ের যে কোন্ নিভৃত ভূগর্ভস্থ কক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন, তার আর কোন সন্ধানই হল না।—সেই বিরাট প্রাসাদ-দুর্গের পর্বতপ্রমাণ মাটি-পাথরের চাপে হতভাগ্যদের সাদা হাড়গুলো যে কোন্ বায়ুশূন্য অন্ধকার ভূকক্ষে তিলে তিলে গুঁড়ো হচ্ছে, কেউ তার খবর পর্যন্ত জানে না।

* * * *

ওই ছোট খালটা প্রকৃতপক্ষে সন্দ্বীপ চ্যানেলেরই একটা খাড়ি। খাড়ির ধার থেকে একটুখানি গেলে গভীর অরণ্যের ভিতর কীর্তি রায়ের গড়ের বিশাল ধ্বংসস্তূপ এখনও বর্তমান আছে দেখা যাবে। খাল থেকে কিছু দূরে অরণ্যের মধ্যে দুই সারি প্রাচীন বকুল গাছ দেখা যায়, এখন এ বকুল গাছের সারের মধ্যে দুর্ভেদ্য জঙ্গল আর শুলো-কাঁটা বন, তখন এখানে রাজপথ ছিল। আর খানিকটা গেলে একটা বড় দিঘি চোখে পড়বে। তারই দক্ষিণে কুচো ইটের জঙ্গলাবৃত স্তূপে অর্ধপ্রোথিত হাঙর-মুখো পাথরের কড়ি, ভাঙা থামের অংশ—বারোভূঁইয়াদের বাংলা থেকে, রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের বাংলা থেকে বর্তমান যুগের আলোয় উঁকি মারছে। দিঘির যে ইষ্টক-সোপানে সকাল-সন্ধ্যায় তখন অতীত যুগের রাজবধূদের রাঙা পায়ের অলক্তকরাগ ফুটে উঠত, এখন সেখানে দিনের বেলায় বড়-বড় বাঘের পায়ের থাবার দাগ পড়ে, গোখুরা কেউটে সাপের দল ফণা তুলে ঘুরে বেড়ায়।

বহুদিন থেকেই এখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে থাকে। দুপুর রাতে গভীর বনভূমি যখন নীরব হয়ে যায়, হিন্তাল হিজল গাছের কালো গুড়িগুলো অন্ধকারে যখন বনের মধ্যে প্রেতের মত দাঁড়িয়ে থাকে—সন্দ্বীপ চ্যানেলের জোয়ারের ঢেউয়ের অলোকোৎক্ষেপী লোনা জল খাড়ির মুখে জোনাকির মতন জ্বলতেথাকে—তখন খাল দিয়ে নৌকো বেয়ে যেতে যেতে মোম মধু সংগ্রাহকেরা কতবার শুনেছে, অন্ধকারে বনের এক গভীর অংশ থেকে কারা যেন আর্ত স্বরে চিৎকার করেছে—ওগো পথযাত্রীরা, ওগো নৌকোত্রীরা—আমরা এখানে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেলাম—দয়া করে আমাদের তোল—ওগো আমাদের তোল—

ভয়ে এ পথে কেউ নৌকো বাইতে চায় না।



ওনারা

মনোজ বসু

চেনা জানা নেই বলেই ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে আছেন। মানুষের সঙ্গে বিরোধ নাকি ওনাদের—মানুষ কিসে জব্দ হয়। সেই ফিকির সর্বদা। গাঁ-গ্রামের মানুষ আমরা কিন্তু বলি উল্টো কথা: অতিবড় সুহৃৎ আমাদের। আমায় না মানলেন, রমণী দাসীকে আলবৎ মানবেন—খাল-বিল-জল-জঙ্গল, বলতে গেলে, গোটা ত্রিভুবনই যার পায়ের তলে। নটবর চৌকিদারকেও মানতে হবে—নীল জামা গায়ে চড়িয়ে পাগড়ি পরে কোমরে চাপরাশ এঁটে নিশিভোর-যে গৃহস্থ সামাল দিয়ে বেড়ায়।

রাত বাড়ে। আসর ছেড়ে দিয়ে তো আমরা শয্যা নিলাম, ওনাদেরই তখন চলাফেরা, কাজকর্ম, রঙ্গ-রসিকতা। চিরকাল পাশাপাশি থেকে দহরম-মহরম দস্তুর মতো আমাদের উভয় তরফে। ঝগড়া কচকচি কি আর হয় না—একসঙ্গে থাকতে গেলে সময় বিশেষ একটু আধটু হবেই। দুটো ঘটি-বাটি এক জায়গায় রাখলে ঠোকাঠুকি হয়ে যায়, এ তবু—

এই দেখুন, উপমায় ভুল হয়ে যাচ্ছিল। বলতে যাচ্ছিলাম 'এ মানুষ' —ঢোক গিলতে হল। এক পক্ষ আমরা মানুষই বটি, কিন্তু দেহের জেলখানা থেকে ছাড় পাবার পর ওনারা আমাদের সঙ্গে এক ব্রাকেটের অন্তর্ভুক্ত কেন হতে যাবেন! এবং দেহ বাতিল করে বায়ুভূত অবস্থায় যখন আছেন, ঠোকাঠুকিই বা কেমন করে হবে?

চটে যাচ্ছেন—নাম না ধরে 'ইনি' 'উনি' বলে অত খাতির কিসের? আজ্ঞে হ্যাঁ, নাম করতে নেই। সাহসে কুলায় না, কবুল জবাব দিচ্ছি। হা-পোষা গৃহস্থ মানুষ, ক্ষমতা দেখলেই 'আজ্ঞে' 'আজ্ঞে' করি আমরা—

লুকোছাপা নেই। বাদাবনে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বাঘ আর নেই—তিনি হলেন 'বড় মিঞা'। বউদেরও দেখুন না। গাঁয়ের পুরুষ অদ্যাপি প্রতাপশালী-ভদ্রলোক কিংবা স্ত্রীলোক হয়ে যায়নি। কোন বউ সেই কারণে শ্বশুর ভাসুর বা বরের নাম ধরবে না। মরে গেলেও না। দক্ষিণ বাড়ির মেজোবউর অসুখ হলে ধনঞ্জয় কবিরাজ ওষুধ দিয়ে গেলেন। বড়জা জিজ্ঞাসা করেঃ অনুপান কি দিল রে মেজো, ওষুধ কি দিয়ে খেতে হবে? মেজোবৌ বলল, ভাসুরের রস আর আমার তেনার ছিটে। বুঝলেন কিছু? তুলসীপাতার রসে অষুধ মেড়ে মধু ছিটিয়ে খেতে হবে কবিরাজের নির্দেশ। কিন্তু তুলসিচরণ হলেন ভাসুর এবং মধুসূদন স্বামী। নাম করবার জো নেই. ঠারে ঠোরে চলতে হল।

হাসছেন, কিন্তু আপনারাই বা কি। ক্ষমতাবানের নাম ধরেন আপনারা, বলুন। পুঁটিরাম দাস স্বদেশ সভার চেযার-বেঞ্চ বয়ে এবং কারবাইড জ্বেলে দিয়ে বরাবর দেশের কাজ করে এসেছে। স্বাধীনতার পরে তালেগোলে সে-ও এক মন্ত্রী। আপনাদের মুখে তখন আর পুঁটিরাম নেই—এইচ এম অর্থাৎ অনারেবল মিনিস্টার। বাতে অথ হয়ে সেই পুঁটিরামের মন্ত্রিত্ব গেল তো রাজ্যপাল হবার তদ্বিরে লাগল। আপনারাও সঙ্গে সঙ্গে 'হিজ এক্সেলেন্সি' জিভে শড়োগড়ো করতে লেগেছেন। তদ্বিরে কিন্তু কাজ দেয় নি। বাতের ব্যাথা নিয়ে ঘরে ফিরতে হল তাকে, এবং ঘুরে ফিরে, সেই "পুটিরাম'ও নয় 'পুঁটে দাস' এবারে।

গাঁয়ের পূর্ব দিকে তেপান্তর বিল। এখানে সেখানে খানিক খানিক উঁচু জায়গা—দ্বীপের মতন। একটা জায়গার নাম বামুন ভিটা—কোনো এক কালে ব্রাহ্মণের বাস্তু ভিটা ছিল সম্ভবত। পুকুর ছিল, ভরাট হয়ে গিয়ে এখন ক্ষুদ্র ডোবা। আর বেল ও তেঁতুল গাছ কয়েকটা, কালকাসুন্দে ভাঁট বৈচি ও শ্যাওড়ার জঙ্গল। আর আছে অতি বিশাল একবট—ঝুরির ঠেকানো দিয়ে বিস্তর কাল ঝড়ঝাপটা ঠেকিয়ে আসছে। সব অঞ্চল থেকে এই বটগাছ দেখতে পাবেন। যত তুখোড়ই হোন, বিলে নেমে পথ ভুল হবেই—বটগাছ তখন নিশানা। বটতলায়

দাঁড়িয়ে দিক সাব্যস্ত করে নেবেন। চাষবাসের মরশুমে ভর দুপুরে লাঙল ছেড়ে চাষীরা বটের ছায়ায় শুয়ে বসে জিরোয়, হালের গরু ডোবায় নেমে জল খায়। দিনমানে এই সন্ধ্যার পরেও নিশানা বটগাছ। ভুলেও কিন্তু তখন বামুনভিটা মাড়াবেন না—খবরদার! ওনাদের আস্তানা-হাই তুলে গা ঝাড়া দিয়ে এইবারে সবভুঁয়ে নামছেন, বিষয় কর্মে বেরোবেন। নিতান্তই আপনার যাবার প্রয়োজন তো দুতিন রশি অন্তত দূরে দূরে যাবেন।

কতশতবার বামুন ভিটায় গেছি—বটের ডালে ডালে যত পাতা তত বাদুড়। সারা দিনমান নিঃসাড়ে ঝুলে থাকে, সন্ধ্যা হলে সম্বিত পায় যেন সহসা—কালো পাখায় অন্ধকারের গায়ে ঝাপটার পর ঝাপটা মেরে চতুর্দিকে গাঁ-গ্রামে চরতে বেরোয়।

নটবরের মতে বাদুড়ই নয় আদপে ছলা কলা ওনাদের, দিনমানে বাদুড় মূর্তি ধারণ করে থাকেন। স্বচক্ষে নটবর একদিন মূর্তি বদলও দেখে ফেলেছিল—লহমায় বাদুড় বিকটাকার হল। সেই তিনি ঠাহর পেয়ে রেগেমেগে বললেন, দেখলি বুঝি? যে চোখে দেখেছিস, সেই চোখ দুটো খুবলে তুলে নেবো, দাঁড়া। নটবর ডরাতে যাবে কেন, অষ্ট বন্ধন সেরে নিয়ম দস্তুর তাগা-তাবিজ ধারণ করে তৈরি হয়ে বেরিয়েছে। বলল, ক্ষমতা থাকে চলে আসুন না, কে কার চোখ খুবলে নেয় দেখি। বেগতিক বুঝে উনি তখন সরে পড়লেন।

বামুনভিটার জোবাটা হল আলচোরদের আড্ডা (সংক্ষেপ করে আপনারা আলেয়া বলে থাকেন)। রাত্রি হলে জলতল থেকেউঠে গা-ঝাড়া দিয়ে সারা বিল গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়ান। কালো রঙের মস্ত মস্ত হাঁড়া। রমণী দাসীর রূপ বর্ণনা—হাঁড়ি অতিকায়ত্ব পেয়ে পুংলিঙ্গে 'হাঁড়া' নাম নিয়েছে) নিশ্বাস নেবার করণে মুখগহ্বর ক্ষণে ক্ষণে হাঁ হয়ে পড়ে ভক করে আগুনের হলকা বেরিয়ে আসে অমনি। মুখ বুঁজলে আবার অন্ধকার। ভীতু লোকে বদনাম রটায়, নাকি পথভ্রান্ত পথিককে আলোর ধাঁধায় ফেলে জলার দিকে নিয়ে ঘাড় মটকে রক্তপানের

মতলব ; বিলকুল মিথ্যে—আমার ভাইঝির কাছে শুনুনগেযান, প্রশংসায় সে পঞ্চমুখ।

বর্ষা রাত্রে একবার ডিঙি নৌকায় বিল পাড়ি দিয়ে বাপের বাড়ি আসছে, পথ ঠাহর পাচ্ছে না—দপ করে আলো জ্বলল দূরে। ঐ তো গ্রাম, তবে ঐ দিকে—দ্রুত কেঠে বেয়ে সেইখানটা এসে দেখল, কোথায় কী, নিঃসীম জলরাশি কেবল। এবং দূরে আবার আলো দপ-দপ করছে। মাঝি বলল, গতিক ভাল নয় দিদিমণি, ধ্বজি পুঁতে এখানেই থেকে যাই। নির্ভীক ভাইঝি শুনল না, চিরকাল ওনাদেরই আশ্রয়ে আছি, আমাদের সঙ্গে কেন গোলমাল করবেন? চলো মাঝি, কোন চিন্তা নেই। চলতে হল হুকুম মেনে। সেই জায়গায় পৌঁছানোর পর আর কোনো দিকে নতুন করে আলো জ্বলে না। নিরিখ করে দেখা গেল, গাছ-গাছালির ফাঁকে দক্ষিণ-বাড়ির চিলে-কোঠা। এসেই গেছি তবে তো—ওনারাই পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

জাত বেজাত আছে দস্তুর মতো মরে গিয়েও মানুষ জাত ছাড়ে না। ব্রাহ্মণ যিনি ছিলেন, এখনো বর্ণশ্রেষ্ঠ ওনাদের মধ্যে—ব্রহ্মদৈত্য। ব্রহ্মদৈত্যও একটি নাকি আছেন বামুন ভিটায়—যাঁর নামে বামুন ভিটা, হয়তো বা তিনিই বারোয়ারি নিবাস বটগাছে সকলের সঙ্গে থাকতে নারাজ বলে পবিত্র বেলগাছ একটা তাঁর জন্যে। ধবধবে পৈতে ঝুলিয়ে খড়ম খটখট করে এঁটো-কাঁটা এড়িয়ে নিশিরাত্রে সতর্ক পদক্ষেপে বিচরণ করছেন—এমনি অবস্থায় নটবর বহুবার দেখেছে তাঁকে।

বাস্তুসাপ থাকে—সেকালে দক্ষিণ-বাড়িতেই একটি ছিল শুনেছি। খুব সহিষ্ণু—অন্ধকারে নাদেখে ঘাড়ের উপর পা চালিয়ে দিলেও কিছু বলত না। বাচ্চা ছেলে-পুলে বড় প্রিয়, ঘুমন্ত শিশুর মাথার উপরে ফণা তুলে পাহারা দিত। সাপ ফণা মেলে রয়েছে, কার সাধ্য কাছে এগোয়! গর্ভধারিণী মা পর্যন্ত সাহস পান না। কাকুতি মিনতি করেন : খোকন দুধ খাবে, ছেড়ে দাও মা এবারে। ফণা নামিয়ে ধীরে ধীরে সাপ গর্তে ঢুকে গেল। পরের দিন মনসাতলায় দুধ কলা দিয়ে গিন্নি আরও খুশি করে এলেন। খুশি ছিল সত্যিই সে গৃহস্থর উপর। মণিমাণিক্য

কোথায় থাকে, সাপদের জানা—মাথায় কেউ কেউ মণি ধারণ করেও বেড়ায় জনশ্রুতি, একটা মণি দক্ষিণ-বাড়ির কর্তাকে দিয়েছিল। গাঁয়ের মধ্যে প্রথম দোতলা পাকাবাড়ি উঠল সেই মণি বিক্রির পয়সায়।

রাগ তেমনি প্রচণ্ড। সাবরেজিস্ট্রারবাবু বিলে পাখি শিকার করতে এসে দক্ষিণ-বাড়ি উঠেছিলেন। সাপে ব্যাঙ ধরেছে, ব্যাঙ কাতরাচ্ছে—সাবরেজিস্ট্রার বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ঘা মারলেন সাপের মাথায়। ব্যাঙ ছেড়ে সাপ পালিয়ে গেল। কর্তা বললেন, সর্বনাশ করেছেন মশায়—কাকে ঘাঁটা দিলেন, জানেন না। সাত ক্রোশ দূরে মহকুমা শহরে ফিরে গেছেন সাবরেজিস্ট্রার, সন্ধ্যার পর ক্লাবে গিয়ে পাশায় বসেছেন। সাপ খোঁজে খোঁজে ঠিক চলে গেছে। এঁকে বেঁকে সকলকে বাদ দিয়ে সাবরেজিস্ট্রারের পিঠের উপর ছোবল দিল, শত চেষ্টাতেও সে বিষ সাহায্য হল না।

মারা যাবার পরে মেজো বউও অমনি বাস্তু জুড়ে ছিল। দক্ষিণ-বাড়ির অবস্থা পড়ে গিয়েছে তখন দোতলা কোঠাবাড়ি ধ্বসে গলে পড়ছে। মেজোকর্তা মধুসূদন বড়াল এস্টেটের নায়েব—সদরে থাকেন, বাড়ি কালেভদ্রে আসতে পান। এই সময়ে তৃতীয় কন্যা সুরি অর্থাৎ সুর-বালার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল মদনার বানোয়ারী দত্তর ছেলের সঙ্গে। চার-পাঁচ মাস হাতে রেখে লগ্নপত্র পাকা করেছেন, আয়োজন এই সময়ের ভিতরে সম্পূর্ণ করে ফেলতে হবে। টাকা কড়ি যখন যা যোগাড় হয়, বাড়ি এসে মেজো বউর কাছে রেখে যান।

এক বুড়ো মানুষ একদিন অতিথি হয়ে এলেন। বড় বৌ বাপের বাড়ি গেছে, মেজোবউ গিন্নী আপাতত। বউটা ভাল, অতিথি-অভ্যাগত এলে খুব যত্নআত্তি করে। আপ্যায়নে বৃদ্ধ গলে গেলেন একবারে, একেবার মা মা করছেন। আহারাদি অন্তে চলে যাবার মুখে মেজো-বউকে ডেকে চুপিচুপি বললেন, কিছু গয়না আছে আমার সঙ্গে। একজন বেচতে দিয়েছে, বেচে দিলে কিছু কমিশন পাব। ক্ষিধের মুখে অন্ন দিয়েছ মা, তুমি যদি নিতে চাও সস্তা দরে দিয়ে দেব। গঞ্জ অবধি তা হলে আর যাইনে।

চোখ টিপে বললেন, ধর্মপথের জিনিস নয়—বুঝতেই পারছ। দশ জায়গায় যাচাই চলে না। এর বেশি আর দর উঠল না—সেই মানুষকে গিয়ে বলব। ব্যস, খতম।

গামছার পুঁটলি খুলে গয়না দেখালেন। বালা-তাগা-বিছেহার—ভারীসারি জিনিস, তবে প্যাটার্ন সেকেলে—ভেঙে নতুন করে গড়াতে হবে। কুড়িয়ে বাড়িয়ে মেজো বউর কাছে ষাটটি টাকা হল, সদাশয় বৃদ্ধ তাতেই দিয়ে দিলেন। ষাট টাকায় নেহাতপক্ষে দেড়শ টাকার জিনিস—দাঁও মারা দস্তুর মতো। বোকাসোকা বলে মেজো বউকে মেজো কর্তা বিদ্রূপ করেন—বাড়ি এলে এইবারে জিজ্ঞাসা করব: কেমন?

তৎপূর্বেই বড়জা বাপের বাড়ি থেকে ফিরে একেবারে বসিয়ে দিল: সর্বনাশ করেছ মেজো, ভালমানুষ পেয়ে তোমায় ঠকিয়ে গেছে।

অমন মুনি ঋষির মতন চেহারা, প্রতি কথায় একবার করে মা বলে নেন—হতে পারে তাই কখনো! গঞ্জ থেকে স্যাকরা ডেকে এনে কষ্টি ঠুকে দেখা হল। সোনা-ই নয়—কোন সন্দেহ নেই আর। কন্যাদায় মোচনের জন্য দরিদ্র মধুসূদনের তিলে তিলে সঞ্চয়ের টাকা—পাখি যেমন ঠোঁটে করে খড়কুটো বয়ে বয়ে আনে। যা রাগি মানুষ—বাড়ি এসে কুড়াল নিয়ে বউয়ের মাথায় মেরে বসবেন, অথবা নিজের মাথায়।

সেই বাড়ি আসা অবধি মেজো বউ সবুর করল না। তিন ছেলে কোলে। শেষরাতের দিকে ছেলে বিষম কান্না কাঁদছে, গলা শুকিয়ে উঠেছে দুধের জন্য। ওঘর থেকে বড় বউ উঠে এসে দরজা ঝাঁকাচ্ছে: মরে ঘুমুচ্ছ নাকি মেজো, শুনতে পাও না? ধাক্কা দিতে জানালার কবাট খুলে গেল, চাঁদের আলো পড়ল ঘরের মধ্যে। মেজো বউ শূন্যে ঝুলছে—ছাতের কড়ির সঙ্গে শাড়ি বেঁধেছে, ভিন্নপ্রান্ত নিজের গলায়।

বাইরে রটনা, ভেদবমি হয়ে মেজো বউ মারা গেছে। আত্মঘাতী হয়েছে, থানায় টের পেলে দেহ সদরে চালান দেবে কাটাকুটির জন্য। বাড়ির লোক নিয়ে টানাহেঁচড়া করবে। বিস্তর হাঙ্গামা।

সেই থেকে আজব কাণ্ড। মেজো বউ বাড়ীর মায়া ছাড়তে

পারলেন না। নিজের কোলের ছেলে বলে নয়, জায়েদের ননদদের যাবতীয় ছেলেপুলের দেখাশুনো তদ্বির-তদারকের দায় তাঁর উপর। দিনমানে পারেন না, সন্ধ্যার পর থেকে। সেই তো বিস্তর। মেজোর উপর দায় চাপিয়ে বউরা নিশ্চিন্তে রান্না ঘরে থাকে রাত ছুপুর অবধি আসবার মুখে আলো নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করবে, এই খেয়াল টুকু থাকে যেন। দরজা খোলা থাকুক বা বন্ধ থাকুক, যায় আসে না। বাচ্চা ঘামছে তো মেজো অমনি তালপাতার পাখায় হাওয়া করবেন। দোলনায় আছে তো দোল দিচ্ছেন মৃদু মৃদু, পায় মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। এই সমস্ত উঁকিঝুকি দিয়ে দেখেছে বাড়ির লোক। গোড়ায় ভয়-ভয় করত, এখন সোয়াস্তি। ঝি-চাকর ছুর্লভ আজকাল। যদিই-বা মেলে, শতেক বায়নাক্কা মানুষের। মাইনে দশটাকা, চারবেলা খাওয়া, বছরে চারখানা কাপড় এবং হাটবাজারের ষোল আনা দায়িত্ব। এই শেষেরটা অতি অবশ্য—কারণ কেনা জানে! তার উপরেও আছে···আজ নিজের অসুখ, ছু-দিন বলে গেল তো বিশ দিনের আগে দেখা নেই মেজোকে নিয়ে খরচ-খরচা ঝক্কি-ঝামেলা কিছু মাত্র নেই। দোতলা একতলা বা টিনের ঘরে যেন উড়ে বেড়াচ্ছেন—যেখানে যে বাচ্চা একটু কুক করে আওয়াজ দিল, চক্ষের পলকে মেজো অমনি তার পাশে।

সুরির বিয়ে। বনোয়ারী দত্ত তারিখ পিছানোর জন্য বলে দিলেন—একটা গোলমেলে ফৌজদারিতে পড়েছেন, বিয়ে যেদিন মামলা ঠিক তার পরের দিন। কিন্তু মধুসূদনও কম ঘড়েল নন। দশের মুকাবেলা সিঁছুরে রাজমুণ্ডের ছাপ দিয়ে লগ্নপত্রে সই হয়েছে—সে বস্তু রেজিস্ট্রি-দলিলের বাবা। চুক্তির কোন অঙ্গের হেরফেরে রাজি নন তিনি, দলিল তাতে কেঁচে যায়। বাইরে অবশ্য করজোড়ে ছলছল চোখে বললেন, আপনার সঙ্গে কুটুম্বিতের যার বড় সাধ, সে চলে গেছে শরীর আমারও বেশ ভাল যাচ্ছে না। শুভকর্ম নিয়ে আলাদা কোন আদেশ করবেন না বেআইমশায়। তাছাড়া-নেমন্তন্ন-আমন্ত্রণ সারা—দিন টালটালে অপদস্তের কারন ঘটবে। ছুহাত এক করে ছুটো ফুল ফেলেই

আপনাকে ছেড়ে দেবো—জোয়ার ধরে বেলা আটটার মধ্যে সদরে পৌঁছে যাবেন। মামলার কোন হানি হবে না।

অগত্যা তাই। বর—বরযাত্রীরা সব পৌঁছে গেছে। বানোয়ারী বিশেষ কয়েকটিকে বরযাত্রী করে নিয়ে এসেছেন, বিয়েথাওয়ার পরে বনোয়ারীর সঙ্গে একত্র সদর চলে যাবে—ফৌজদারির সাফাই-সাক্ষি তারা মধুসূদনের কাছে বনোয়ারী পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন: মস্ত দরের মানুষ এঁরা সব, আমার বড্ড আপন—বলে কয়ে অনেক করে এনেছি।

মধুসূদন তটস্থ হয়ে বললেন, আপন জন আপনার, দরের কথা তবে আর আলাদা করে বলতে হবে কেন? এ বাড়ির পরম ভাগ্য, এঁদের মতন মানুষের পদধুলি পড়ল।

বনোয়ারী অতঃপর আসল কথায় এলেন: মা-লক্ষ্মীর গহনা এঁরা একটু দেখতে চাচ্ছেন। আমি সব বলে দিয়েছি—বেহাই আমার বনেদি বাড়ির শৌখিন মানুষ। মেয়ে তো চোখের মণি একেবারে—গয়না যা দেবেন, পাইতকের মধ্যে কেউ তা চর্মচক্ষে দেখেনি।

শেখানো ছিল, লোকটা গড়গড় করে কথাগুলো বলে গেল: শুনেই তো লোভ বাড়ল মশায়। ঘরে অরক্ষণীয়া মেয়ে—পাত্রস্থ করতে হবে। আজকাল কোন প্যাটার্নের কেমন সব গয়না বলে, দেখব। কনের গায়ে উঠে গেলে তখন তো এক ঝলক একটুখানি চোখের দেখা। তা হবে না আমার, হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে জিনিসগুলো খানিক খানিক মুখস্থ করে নেবো।

এই কথার ভিতরেই মধুসূদন অজুহাত খুঁজে পেলেন: কনে সাজিয়ে ফেলেছে বেহাইমশায়রা, গায়ে তো উঠেই গেছে গয়না।

বনোয়ারী এবার কড়া হয়ে বললেন, গা থেকে তবে খুলে আনতে হবে—উপায় কি! বিশিষ্ট এঁরা সব দেখতে চাইছেন—ভিতরে মায়েদের বলুন গিয়ে, এ আবদারটুকু না রাখলে আমি অত্যন্ত অপদস্থ হবো।

শুকনো মুখে মধুসূদন ভিতর-বাড়ি চলে যান। যেখানে বাঘের

সেখানে সন্ধ্যে হয়। গয়নার কারসাজি ঘুঘু বনোয়ারী কেমন করে টের পেয়েছে। মরা সোনার মিশাল আছে, আবার লগ্নপত্র অনুযায়ি সোনা যে পরিমাণ দেবার কথা ওজনেও তারচেয়ে কিছু কম। মৃত মেজো বউয়ের উপর খাপ্পা হয়ে কলহ করেন: কাণ্ডটা ঘটালেন তো উনি। এ-বাজারে যাট-যাটটা টাকা গচ্চা দিলেন—প্রাণদান দিয়েও তো যাটটা পয়সা উশুল হল না। ধরা-ছোঁওয়া এড়িয়ে মজাসে উনি সাড়াগাছে ঠ্যাং দোলাচ্ছেন—মর শালারা এখন কানমলা খেয়ে।

জ্যেষ্ঠ তুলসীচরণের পুত্র রাখালরাজ ডন-বৈঠক করে—তাগড়াই জোয়ান। সে সাহস দিচ্ছে: গয়না নিয়ে দেখানগে কাকা, কী হয়েছে! বলি, বাড়িটা আমাদের না বনোয়ারী দত্তর? কে কার কানমলে, দেখা যাক। পরিবেশনের ছুতোয় ক্লাবের বন্ধুদের এনে আমিও মজুত করে রেখেছি।

তৈরি হয়ে এসেছেন বনোয়ারী সত্যিই। গয়না বৈঠকখানায় আসতেই এক বরযাত্রী চাদরের নিচে থেকে ওজনের নিক্তি বের করলেন, চুড়িদার পাঞ্জাবির পকেট থেকে অপরে একটুখানি পাথর। রাখালরাজ অমনি বাঘের মতন লম্ফ দিয়ে পড়ে পাথর-নিক্তি কেড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল উঠানে: ভেবেছেন কি মশয়রা! কুটুম্বিতে করতে এসে কুটুম্বুর মুখের কথায় বিশ্বাস নেই—পাথর ঠুকে ওজন করে দেখতে হবে?

সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হয়ে বরকর্তাও এবারে নিজ মূর্তি ধরলেন: মনে পাপ বলেই মেজাজ, সে কি আর বুঝিনে বাপু! লগ্নপত্রে আবদ্ধ আছি—নয়তো মা অপঘাতে মরেছে, সে মেয়ে অনেক আগেই বাতিল হত। কিন্তু চুক্তির খেলাপ আপনারাই করেছেন—শুভকর্ম আর হতে পারবে না। ফৌজদারি ফারাকা হয় হবে—তিন নম্বর ঘাড়ে ঝুলবে, আরও না-হয় দু-এক নম্বর বাড়বে। কেয়ার করি নাকি?

ছেলের উপর হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন: উঠে আয় ফটিক, বিয়ে করতে হবে না! মালা টোপর খুলে ফেল।

ফটিক তা বলে কাঁচা-ছেলে নয়—মচ্ছব কদ্দুর গড়ায়, শেষ পর্যন্ত

না;দেখে বরাসন ছাড়ছে না। বনোয়ারী বড় বেশি ধমক-ধমক লাগালেন তো ফটিক নড়েচড়ে উঠল, দম ফুরিয়ে নরম হলেন তো সে-ও পায়ের উপর পা চাপিয়ে চেপে বসল আবার।

ধৈর্য হারিয়ে বনোয়ারী বললেন, পিতৃ-আজ্ঞা কানে ঢুকছে না? বলি, কানে ধরে ওঠাতে হবে নাকি এত লোকের মধ্যে?

রাখালরাজের বন্ধুরা পাল্টা বলে ওঠে, পাড়া থেকে বর তুলে নেবেন—মাইরি আর কি! ধরুন আপনারা কান, আমারাও আর এক কান ধরি। কাদের কত জোর, পরখ হয়ে যাক। এক ছোঁড়া বলল, পারবেন না মশায়। ইস্কুলের মাঠের টাগ-অব-ওয়ারে এই সেদিনও আমরা জিতে এসেছি।

দাঁড়িয়ে পড়েছে রাখলরাজ ও বন্ধুরা, মালকোঁচা আঁটছে। বনোয়ারীও গাঁ ছাড়বেন না মগের মুলুক পেয়েছে নাকি হে? গয়না পত্তর বরসজ্জা নগদ পণ পাই-পয়ষাটি অবধি মিটিয়ে তবে বর ছুঁতে আসবে। নয়তো আলাদা সস্তার বরের তল্লাস করো। সময় আছে—শেষরাত অবধি লগ্ন, কানা-খোঁড়া মুখ্যুসুখ্যু মিলে যাবে যা হোক কিছু।

ভ্রূক্ষেপমাত্র করল না কন্যাপক্ষীয়েরা। দুই জোয়ান-মরদ দু-দিকে দিয়ে ফটিকের ডানা ধরে উঁচু করে তুলেছে। বলে, ঝগড়া-ঝাটির মধ্যে কেন থাকা! বর আগেই না হয় ছাতনা তলায় গিয়ে বসলেন। তাতে কোন দোষ হয় না। মেয়ের দল আছে, ফষ্টি-নষ্টি করবে—দিব্যি সময় কেটে যাবে।

প্রস্তাব হতে না হতে আরও বিস্তর তৈরি ছিল বাইরে, রে-রে করে বৈঠকখানায় ঢুকে গেল। হাত তো ধরাই আছে ঠ্যাং ধরেছে কয়েকজন, কোমর ধরেছে, মুণ্ডু ধরেছে চ্যাংদোলা করে বরকে পাঁচিলের দরজা দিয়ে চক্ষের পলকে বাড়ির ভিতরে ঢোকাল।

বনোয়ারী হতভম্ব মুহূর্তকাল। তারপরে চেঁচাচ্ছেন:—মন্তোর পড়িসনে ফটকে। খুন করে ফেললেও না। পিতৃ-আজ্ঞা—পিতা-স্বর্গ পিতা-ধর্ম খেয়াল রাখিস।

এক ছোঁড়া খল খল করে হেসে বলল সে বোঝা যাবে। তাড়াতাড়ি

বাড়ি গিয়ে আপনি বউভাতের বন্দোবস্ত করুন গে দত্ত মশায়। বর-বউ যথাকালে গিয়ে পৌঁছবে, আমরাও সাথে সঙ্গে গিয়ে নেমন্তন্ন খেয়ে আসবো।

ঘড়াং করে পাঁচিলের দরজায় হুড়কো পড়ে গেল।

মধুসূদন গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন এতক্ষণে আবির্ভূত হয়ে যাচ্ছে তাই গালিগালাজ করছেন: হারামজাদা নচ্ছার ছোঁড়াগুলো কাজের বাড়ি বলে এখন কিছু বলছি নে, ধরে ধরে আগাপাস্তলা চাবকাব আপনাকে বলে রাখলাম বেহাই। আসুন এইবারে আপনার ঐ সব আপনাদের নিয়ে। জোয়ার এলেই তো বেরিয়ে পড়বেন—আগে ভাগে চাট্টি সেবা সেরে নিন। জায়গা হয়েছে।

আগুনে আরও ঘৃতাহুতি। মুখের আড় রইল না, বনোয়ারী 'আপনি' থেকে 'তুমি' তে নেমে বললেন, তোমার জায়গার মুখে ইয়ে করি আমরা। চলো হে চলো যতক্ষণ জোয়ার না অসেছে, নৌকাতেই পড়ে থাকব। এখানে তিলার্ধকাল নয়।

অন্যদের কিন্তু চনমনে ক্ষিধে পেয়ে গেছে। ক্রোধও এতদূর প্রবল নয়। বলে, যে ভাবেই হোক বেহাই তো হতে চলেছেন। ভদ্রলোকের এত আয়োজন নষ্ট হবে, এ বাজারে মোটেই সেটা উচিত হবে না।

বনোয়ারী দত্ত আগুন হয়ে বললেন, বুঝতে পেরেছি। ঘাটের উপর উৎকৃষ্ট চিঁড়ে মুড়ি বেগুনি ফুলুরির দোকান। দুখানা শুকনো লুচি না-ই বা চিবোলে। গণ্ডে গণ্ডে গেলাবো তোমাদের ঘাটে নিয়ে। চলো—

গরু তাড়ানোর মতোন বনোয়ারী তাদের তাড়িয়ে বের করলেন। রাখালরাজ অভয় দিয়ে বলে, কিছু ভাববেন না কাকা, আয়োজনের একটি কণাও ফেলা যাবে না যতগুলো আমি এনেছি, গুণে দেখুন। আরো সব ক্লাবে বসে তাস পাশা খেলছে, খবর দিলে ছড়ছড় করে এসে ভাঁড়ারে যা-কিছু আছে চেটেপুঁছে শেষ করে দিয়ে যাবে।

পাঁচিলের দরজায় হুঁড়কো পড়েছে, এবারে ঢাউস তালা সংগ্রহ করে বৈঠকখানার দরজায় লাগাচ্ছে।

মধুসূদন বললেন, দক্ষিণ-বাড়ি দুর্গ বানিয়ে ফেলছ যে!

রাখালরাজ বলে, ঘাটের নৌকায় নৌকায় বিস্তর মাঝিমাল্লা। জেদা জেদির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে—বলা যায় না কাকা, হয়তো বা তাদেরই সব জুটিয়ে এনে হামলা দিয়ে পড়ল বর তুলে নেবার জন্যে। ঘাঁটি সামলে রাখা ভাল।

তারপরে আধঘণ্টাও হয়নি। রাখালরাজের ছোঁড়াগুলো কোঁচা ছেড়ে ভদ্রলোক হয়েছে। বরকে ঘিরে বসে সিগারেট ফুঁকছে, ইয়ার্কি তামাসা করছে। হেনকালে পাঁচিলের দরজায় প্রবল কড়া নড়ে ওঠে। এবং দমাদম ঘা। কান পেতে বনোয়ারীর কণ্ঠও শোনা গেল: দুয়োর খুলুন, ও বেয়াই মশায়—

রাখালরাজ ফিসফিস করে বলে, যা বলেছিলাম কাকা। এসে পড়েছে। পুরুত ঠাকুর কে এত করে বলছি, মন্তোর ক'টা পড়িয়ে তাড়াতাড়ি সাত পাক ঘুরিয়ে দিন। তা যত বায়নাক্কা সুত হিবুক যোগ নাকি পড়েনি এখনো! দলবল জুড়িয়ে এসেছে—কী কুরুক্ষেত্তোর বাধে এবারে দেখুন। সুত হিবুক ধুয়ে খাবেন তখন ঠাকুর মশায়।

ভিতর থেকে রাখালরাজ সন্তর্পণে সাড়া দিল: হল কি আবার যে ফিরে এলেন?

বনোয়ারী ব্যাকুল হয়ে বলেন, বলছি সব। দরজা খোল বাবা!

আজ্ঞে না—ভণ্ডুল দিতে এসেছেন আবার। বিয়েথাওয়া চুকে যাক, তারপরে দরজা খুলব। কাকার হুকুম!

বনোয়ারী বলেন, বিয়ে আলবত হবে। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দেবো। বিশ্বাস করো বাবা, বাপান্ত দিব্যি করছি।

মধুসূদন থাকতে না পেরে বললেন, দরজা খোল রাখাল, বেয়াই মানুষ এমন করে বলছেন—

বলতে বলতে নিজ-হাতেই দরজার হুড়কো উটিয়ে দিলেন। যেই মাত্র দরজা খোলা, হুড়মুড় করে সব ঢুকে পড়ল। যত গিয়েছিল, ঠিক ততগুলো। বেশি নয়, কমও নয়।

মধুসূদন বললেন, হল কি বেয়াই মশাই, ঘাটে যাননি?

যেতে পারলাম কই? ছেলের বিয়ে চোখে দেখব না, মনের মধ্যে বড় খচখচ করতে লাগল। ভেবে দেখলাম, গয়না-টাকা অনিত্য জিনিস আজ আছে কাল নেই। পরের মেয়ে আমার বউমা হতে যাচ্ছেন—তাঁর চোখেও আমি তো ছোট হয়ে আছি। দশ রকম এমনি ভেবে দেখে মান—অপমান অগ্রাহ্য করে ফিরে এলাম।

খাসা করেছেন। মেয়ের ভাগ্যি, মেয়ের বাপ আমারও ভাগ্যি।

কৃতার্থ হয়ে মধুসূদন শতকণ্ঠে তারিফ করছেন। রাখালরাজকে বললেন, চাবি খোল বৈঠকখানার। আলো পাঠিয়ে দাও ওখানে। আর গড়গড়া। বসি গিয়ে আমরা।

কিন্তু দলবলের এবং বনোয়ারীর নিজেরও ঘোরতর আপত্তি: বিয়ে দেখব বলে দৌড় ঝাঁপ করে এলাম। বৈঠকখানায় ঘটকপুর হয়ে বসতে যাব কেন?

লগ্নের তো দেরি আছে—

তা হোক, তা হোক। এত মানুষ রয়েছেন, আমরাই বা কেন বাইরে যেতে যাব?

ছাদনাতলায় কোন ক্রমে বনোয়ারীর একটু বসার জায়গা করা গেল। অন্যেরা ভিড়ের মধ্যে খাড়া দাঁড়িয়ে। তবু বাইরে গিয়ে ভাল হয়ে বসবে না।

রাখালরাজ খপ করে জিজ্ঞাসা করে বসে: কাঁপছেন কেন তালুই মশায়?

কাঁপছি বুঝি? সর্বাঙ্গে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বনোয়ারী নিঃসংশয় হলেন: কাঁপছিই তো বটে, কেমন যেন হঠাৎ শীত ধরে গেল।

বোশেখ মাসে শীত?

হয় বাবাজী। সান্নিপাতিকের ধাত যে আমার।

রাখালরাজ বলে, এই যত আছেন সবাই তো কাঁপছেন—সকলের ধাত-সান্নিপাতিক?

মধুসূদন এই সময়ে এসে বললেন, বরসজ্জা সমস্ত দরদালানে সাজিয়ে দিয়েছে। দেখে আসুন একবার বেয়াই।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বনোয়ারী হাত ঘুরিয়ে দিলেন: বরকনের ব্যাভারে

লাগবে—দেখতে হয়, তারা দেখুক গে। আমার কী গরজ! বিয়ের অঙ্গে খুঁত না থাকে, মন্তোরগুলো নির্ভুল পড়ানো হয়, আমি দেখব শুধু তাই।

সত্যি, নিষ্ঠা বটে বনোয়ারীর! তীক্ষ্ণ চোখে পুরুতের প্রতিটি কাজ দেখছেন, কান পেতে মন্তোর পড়ানো শুনছেন। হেরফের হলে ক্যাঁক করে অমনি ধরেন: ছেলের না-হয় পয়লা বিয়ে। আমি নিজে তিন তিনটে বিয়ে সেরে একর্মে ওস্তাদ হয়ে আছি ঠাকুর মশাই। রীতকর্ম সমস্ত মুখস্থ। পান থেকে চুন খসলেই ধরে ফেলব।

খাওয়া দাওয়া অন্তে বনোয়ারী মউজ করে তামাক খাচ্ছেন, আপন লোকেরা ঘিরে রয়েছে। মাঝি ঘাট থেকে বিয়ে বাড়ি অবধি এসে তাগাদা দিচ্ছে: গেলেগেলে দত্তমশায়—

হুঁ—বলে বনোয়ারী নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধূম উদগারীণ করতে লাগলেন।

মাঝি বলে, দেরি করলে জোয়ারের মধ্যে পৌঁছে দেবো কেমন করে?

বনোয়ারী বিরক্ত হয়ে বলেন, গাঙের জোয়ার এই শেষ নাকি—আর আসবে না?

মাঝি মিন-মিন করে বলল, ফৌজদারি মামলা আছে বলছিলেন কিনা।

বনোয়ারী ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, ফৌজদারির ভয় কেউ যেন আমায় না দেখাতে আসে! তিন নম্বর ঝুলছে এখন মাথায় কোন না আরও তিরিশ নম্বর কেটে বেরিয়ে এসেছি। ফৌজদারি ডাল-ভাত আমার কাছে। ঘাটে গিয়ে ঘুমোওগে মাঝি, কাল দিনমানে যাব।

রাখালরাজকে হাতের ইঙ্গিতে কাছে ডাকলেন: শোন। বেয়াই মশায়কে দেখছিনে, তোমাকেই বলি। আমি বাপু তোমাদের ঐ তেপান্তরের বৈঠকখানায় শুতে পারব না। কন্যা পক্ষেরই তো কত লোক জন, তাদের নিয়ে শোয়াওগে। বাড়ির ভিতরে কোথাও একটা মাদুর ফেলে দিও, সেইখানে আমি পড়ে থাকব।

বনোয়ারীর আপনগুলির মধ্যে একটি বেশ কম বয়সি, গোঁফ ওঠেনি ভাল করে। তারই উপরে রাখালরাজ তাক করেছে, ঘন ঘন তাকে পান—সিগারেট খাওয়াচ্ছে। নিভৃতে নিয়ে বলে, বিয়ে হাজির থাকবার জন্য মন আপনাদের চনমন করে উঠল—ও জিনিস তো শুধু শুধু হয় না।

পথে কিছু খেল দেখে ফিরেছেন জানি। আমরাও হর বখত দেখে থাকি। আজকের খেলটা কি, নতুন—কুটুম্বদের উপর কোন্ খাতিরটা হল বলুন তো।

বলতে কি চায়! নাছোড়বান্দা রাখালরাজ পুরো এক প্যাকেট সিগারেট উজাড় করে দিয়ে তবে দুটো চারটে কথা বের করল: সাংঘাতিক গ্রাম মশায়, থাকেন কি করে আপনারা? মোড় ঘুরতেই মস্ত বড় তাল গাছ রাস্তার ঠিক মাঝখানটায়। এমন স্থানে তালগাছ কি করে জন্মায়—যাবার বেলা তো দেখতে পাইনি। এমনি সব কথা বার্তা হতে হতে বাঁশ ঝাড়ের পাশে এসেছি। সকলের সবগুলো চোখ এক সঙ্গে ঝাড়ের দিকে-ঝড় নেই বাতাস নেই, বাঁশ গাছ নুয়ে পড়েছে আমাদের ঘাড়ে, কঞ্চিগুলো সপাং সপাং করে গায়ে পিঠে বেত মারছে। আগের মানুষ দত্তমশায় তো চোঁচা দৌড়—। মানুষটার কী দুর্গতি—আছাড় খেয়ে পড়লেন তো গড়াতে গড়াতে উঠে আবার দৌড়। পিছন ধরে আমরাও সব দৌড়াচ্ছি। বাঁশ বন পার হয়ে ফাঁকায় এলাম। তারপরে যা কাণ্ড—

সিগারেটে হল না—গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, জল চেয়ে নিল। ঢকঢক করে পুরো একটি গ্লাস খেয়ে বলে, লম্বা থিড়িঙ্গে এলেচুল এক মেয়েলোক সামনেটায় এসে দাঁড়াল দু-দিকে দু-হাত বাড়িয়ে। হাত এক একখানা কম সে কম পনের-বিশ হাত বেড়জালের মতন সব ক'টাকে আমাদের টেনে কোলের মধ্যে ফেলবে।

রাখালরাজ শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে গেছে। অস্ফুট কণ্ঠে বলল, মেজো কাকিমা—দেখতে হবে না!

গড় হয়ে সে প্রণাম করল মেজো বউয়ের পায়ে। বলে, বুদ্ধির ভুলে গয়নার টাকা গড়বড় করে ফেলে দিলেন। রাগারাগি ঝগড়া ঝাটি মিটিয়ে শেষ তুলে দিলেন তিনিই আবার। মেয়ের বিয়ের কোন অঙ্গে খুঁত থাকতে দিলেন না।

———



মধু-মালতী

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

যাঁহারা মহারাষ্ট্র দেশে বাস করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, মারাঠীরা গান ভালবাসে, ফুল ভালবাসে এবং বাইসাইকেল চড়িতে ভালবাসে! পুণার অলিতে গলিতে ফুলের দোকান, গান-বাজনার আখড়া, সাইকেলের আড়ৎ! আড়তে সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায়; এক আনা ভাড়া দিয়া এক ঘণ্টা সইকেল চড়িয়া বেড়াও। মেয়ে-মদ্দ সবাই সাইকেল চড়ে, বিশেষত কলেজের ছেলেমেয়েরা।

এদেশে মেয়েদের আলাদা কলেজ নাই, সকলে একসঙ্গে পড়ে। কলেজের ছুটি হইলে দেখা যায়, রাস্তা দিয়া সাইকেলের নব-যৌবন জলতরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে।

আমি প্রথম যেবার পুণায় আসি, সেবার শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি হোটেলে মাসখানেক ছিলাম। রাস্তার নাম টিলক রোড, অদূরে এস্ পি কলেজ; আরও একটু দূরে টিলার মাথায় পার্বতী মন্দিরের চূড়া দেখা যায়।

দক্ষিণ দিক ফাঁকা, দিগন্তে পাহাড়ের চক্ররেখা। এই চক্ররেখা চক্ষু দ্বারা অনুসরণ করিলে সিংহগড় দুর্গ চোখে পড়ে। শিবাজী মহারাজের সিংহগড়, যে সিংহগড় জয় করিবার মুহূর্তে তানাজি মালেশ্বর প্রাণ দিয়েছিলেন। 'সিংহগড়ের সিংহ গিয়াছে পড়ে আছে শুধু গড়—'

শীতের শেষ। রাস্তার ধারে আমগাছে বোল ধরিয়াছে, মিষ্টি-কষায় গন্ধে চারিদিক আমোদিত। আমি ডাক্তারের আদেশে পুণায় আসিয়াছি, সকাল-বিকাল পদব্রজে ঘুরিয়া বেড়াই। হোটেলে আমার ভিতলের

ঘরের সম্মুখে ছোট্ট একটি ব্যাল্‌কনি আছে, সেখানে দাঁড়াইয়া রাস্তার লোক চলাচল দেখি। বোম্বাইয়ে থাকাকালে যে-পেট জবাব দিয়াছিল, তাহা এখন নানাবিধ স্থানীয় খাদ্য অম্লানবদনে হজম করিতেছে। দহি-বড়া, ইড্‌লি-সম্বর, দোসা—কিছুই বাদ পড়ে না। দশদিন যাইতে না যাইতে প্রাচীনা পুণা নগরীকে ভালবাসিয়া ফেলিলাম।

কিন্তু আমি বিভূতি বাঁড়ুয্যে নই, পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইয়া তিলমাত্র আনন্দ পাই না। অথচ ডাক্তারের হুকুম।

একদিন ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়াইয়া একটি বুদ্ধি মাথায় খেলিয়া গেল। সামনেই রাস্তার ওপারে প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড—বামনরাও সাইকেল মার্ট। সাইকেলের দোকান। কত লোক আসিতেছে, সাইকেল ভাড়া লইয়া চলিয়া যাইতেছে। আমিও সাইকেল চড়িয়া বেড়াই না কেন? অবশ্য অনেক দিন চড়ি নাই, কিন্তু সাঁতার কাটা এবং সাইকেল চড়া মানুষ ভোলে না। সুতরাং সাইকেল চড়িয়া ডাক্তারের আজ্ঞা পালন করিব। যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।

বিকেলবেলা সাইকেলের দোকানে গেলাম। দোকানদার বামনরাও খাতায় আমার নাম-ধাম লিখিয়া লইয়া সাইকেল দিল। বামনরাওয়ের চেহারা বেঁটে, মজবুত, বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ। দোকানের পেছনের একটি ঘরে সস্ত্রীক বাস করে।

অতঃপর রোজ দু'বেলা সাইকেল চড়িয়া বেড়াই। শহর বাজার এড়াইয়া পুণার কিনারে কিনারে ঘুরি। কখনও যাই গণেশখিণ্ডের দিকে, কখনও খড়্‌গবৎসলার হ্রদের পানে! আনন্দে আছি; বামনরাওয়ের সঙ্গে প্রণয় জন্মিয়াছে। সে অল্পস্বল্প হিন্দী বলিতে পারে; নির্বান্ধব পুরীতে সেই আমার প্রথম বন্ধু।

প্রস্তাবনা শেষ করিয়া এবার আসল কথায় আসা যাক।

সে-রাত্রে যথাসময় আহারাদি করিয়া শয়ন করিয়াছিলাম। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসিল না। বোধ হয় দিবানিদ্রা কিছু বেশী হইয়া গিয়াছিল। শুইয়া শুইয়া বই পড়িবার চেষ্টা করিলাম; তাহাতে ঘুম আসে বটে, কিন্তু বই বন্ধ করিলেই তন্দ্রা ছুটিয়া যায়।

রাত্রি প্রায় একটা পর্যন্ত ঝুলোঝুলি করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। গায়ে বালাপোশ জড়াইয়া ব্যাল্‌কনিতে গিয়া দাঁড়াইলাম।

বাহিরে কন্‌কনে ঠাণ্ডা। এক আকাশ নক্ষত্র যেন শীতের বাতাস লাগিয়া কাঁপিতেছে। রাস্তায় লোক নাই, আবছায়া পথের দুই ধারে দীপস্তম্ভগুলি সারি দিয়া এই নিশীথ নিস্তব্ধতাকে পাহারা দিতেছে।

পাঁচ মিনিট দাঁড়াইয়া আছি, উত্তপ্ত মুখে বাতাসের শীতল করস্পর্শ মন্দ লাগিতেছে না। হঠাৎ রাস্তার এক দিক হইতে কিড়িং কিড়িং শব্দ কানে আসিল। সাইকেল আসিতেছে। একটু বিস্মিত হইয়া সেই দিকে তাকাইলাম। সাইকেল দেখা গেল না, এখনও দূরে আছে। কিন্তু রাস্তা নির্জন, সাইকেল চালক কাহাকে দেখিয়া ঘন্টি বাজাইল?

তাকাইয়া রহিলাম।

অস্পষ্টভাবে দেখা গেল, এক জোড়া সাইকেল পাশাপাশি আসিতেছে, তাদের ল্যাম্প নাই। সহসা মধুর হাসির শব্দ কানে আসিল। দুইজন একসঙ্গে হাসিতেছে, একজন পুরুষ একজন স্ত্রীলোক। কিন্তু দুইজনের হাসি এক সুরে বাঁধা। একজন উদারা, একজন মুদারা।

সাইকেল দু'টা ক্রমশ কাছে আসিতেছে, এবার তাহাদের স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। হঠাৎ ঘাড়ের রোঁয়া শক্ত হইয়া উঠিল। সাইকেল দু'টা আসিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের আরোহী নাই। আরোহীর আসন শূন্য, কেবল দু'টা জড় সাইকেল পরস্পর সমান্তরালে চলিয়া আসিতেছে!

বুকের রক্ত হিম হইয়া গিয়াছে, তবু বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া আছি। সাইকেল দু'টা স্বচ্ছন্দ গতিতে আসিতেছে, কোনও ত্বরা নাই। ঠিক আমার সামনে দিয়া যাইতে যাইতে থামিয়া গেল; মনে হইল অদৃশ্য আরোহীরা সাইকেল হইতে নামিল। স্থির বাতাসে যেন ফিসফিস কথা বলার আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তারপর সাইকেল দু'টি বামনরাওয়ের দোকানের দিকে গেল। দরজা বন্ধ, সাইকেল দু'টি দরজার গায়ে হেলিয়া দাঁড়াইল। কিড়িং করিয়া একবার ঘন্টি বাজিল।

তারপর আর কোনও সাড়া-শব্দ নাই।

ব্যাল্‌কনি হইতে আমি ঘরে আসিয়া বসিলাম। এ কি চোখের ভুল? কিন্তু না, শুধু চোখের ভুল হইতে পারে না; হাসি শুনিয়াছি, ঘন্টির আওয়াজ শুনিয়াছি! তবে কি অনিদ্রাবশতঃ আমার মস্তিষ্ক এতই উত্তপ্ত হইয়াছে যে জাগিয়া দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি? কিংবা—

হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়াতে আমি আবার তাড়াতাড়ি ব্যাল্‌কনিতে ফিরিয়া গেলাম।

বামনরাওয়ের দরজা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধ আছে, কিন্তু সাইকেল দু'টা অদৃশ্য হইয়াছে।

শেষরাত্রির দিকে ঘুমাইয়া প'ড়িলাম; যখন ঘুম ভাঙিল তখন ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। প্রাতর্ভ্রমণের আর সময় নাই; কারণ পুণায় শীতকালেও রৌদ্র বেশ কড়া। প্রাতঃকৃত্য সারিয়া ব্যাল্‌কনিতে গিয়া দাঁড়াইলাম।

বামনরাওয়ের দোকান খোলা রহিয়াছে, রাস্তায় কর্মদিবসের ব্যস্ত তৎপরতা; মোটর টাঙা অটো-রিক্‌শা ও সাইকেলের ছুটাছুটি। কাল রাত্রি একটার সময় এই পথের ছায়াচ্ছন্ন নির্জনতায় দুটি স্বয়ংচল সাইকেল আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল বিশ্বাস করা কঠিন।

দুপুরবেলা বামনরাও সাইকেল মার্টে গেলাম।

সাইকেল-ভাড়াটে খদ্দেরের ভিড় কমিয়া গিয়াছে, বামনরাও মোটা একটা খাতায় হিসাব লিখিতেছে। বলিল, 'কাকা, আজ তুমি বেড়াতে গেলে না?'

মারাঠীরা যাহাকে খাতির করে তাহাকে কাকা বলিয়া ডাকে, কিন্তু সকলকেই তুমি বলে।

আমি একটা লোহার চেয়ারে বসিয়া বললাম, 'না, ওবেলা যাব। বামনরাও, কাল রাত্রি একটার সময় তোমার কোনো খদ্দের সাইকেল ফেরত দিতে এসেছিল?'

বামনরাও চকিতে আমার পানে চাহিল, তারপর যেন চিন্তা করিতেছে এমনি ভাবে ঘাড় উঁচু করিয়া গাল চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, 'কই না তো! একথা কেন জিজ্ঞাসা করছ কাকা?'

বলিলাম, 'কাল রাত্রে আমার ঘুম হচ্ছিল না, ব্যাল্‌কনিতে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। মনে হল কারা দুটো সাইকেল রেখে চলে গেল।'

সাইকেলে যে আরোহী ছিল না সে কথা বলিলাম না।

বামনরাও খাতার ওপর চোখ রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল, তুমি ভুল দেখেছ কাকা। অত রাত্রে কে সাইকেল ফেরত দিতে আসবে। মারাঠীরা রাত্রি দশটার মধ্যে সব ঘুমিয়ে পড়ে। তোমারও বেশী রাত জাগা ভাল নয়; কাহিল শরীর আবার অসুখে পড়ে যাবে।'

দেখিলাম বামনরাও সত্য গোপন করিতেছে, নিশ্চয়ই ভিতরে কিছু আছে। তাহাকে আর প্রশ্ন করিলাম না, চলিয়া আসিলাম। মনে মনে স্থির করিলাম, আজ রাত্রেও পাহারা দিব।

মধ্যাহ্নে বেশ খানিকটা ঘুমাইয়া লইয়া বৈকালে বামনরাওয়ের সাইকেল লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। বামনরাও আমার পানে বক্র কটাক্ষপাত করিল। তাহার ভাব-গতিক দেখিয়া সন্দেহ আরও দৃঢ় হইল। যদি কিছুই নয়, তবে লোকটা এমন ঘটি-চোরের মত তাকাইতেছে কেন?

রাত্রি সাড়ে নটার পর আহার সম্পন্ন করিয়া ঘরের আলো নিভাইলাম, ব্যাল্‌কনিতে চেয়ার লইয়া বসিলাম। এমন ভাবে বসিলাম যাহাতে আমাকে বাহির হইতে দেখা না যায়, অথচ আমি সাইকেলের দোকান দেখিতে পাই। বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম নগর ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িতেছে। দোকানগুলি একে একে বন্ধ হইয়া গেল। রাস্তায় রাস্তায় যানবাহনের চলাচল বিরল হইয়া থামিয়া গেল।

বামনরাও প্রায় সাড়ে দশটার সময় দোকান বন্ধ করিল, দু'টি সাইকেল বাহিরে পড়িয়া রহিল। দরজা লাগাইবার সময় সে উৎকণ্ঠিত চক্ষে আমার ব্যাল্‌কনির দিকে তাকাইল।

আমি ঘাপটি মারিয়া রহিলাম।

নগর-গুঞ্জন ক্ষান্ত; রাত্রির গাঢ়তা ঘনীভূত হইতে লাগিল। পথের দীপস্তম্ভমালা নিষ্পলক চাহিয়া আছে। আকাশে লুব্ধক নক্ষত্র মৃগশিরাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়াছে কিন্তু ধরিতে পারিতেছে না।

ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা। গায়ে বালাপোশ সত্ত্বেও বেশ কাঁপুনি ধরিয়াছে। আমি সঙ্গে একটি মঙ্কি-ক্যাপ আনিয়াছি। সেটি মাথায় পরিলে কান দিয়া ঠাণ্ডা ঢুকিতে পারিবে না। বামনরাওয়ের দোকানের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম বন্ধ দরজার সামনে সাইকেল দুটি পরস্পর ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

চট্ করিয়া ঘরে গিয়া মঙ্কি-ক্যাপ পরিয়া ফিরিয়া আসিলাম। বোধ হয় আধ মিনিট সময় লাগে নাই। কিন্তু এ কি! ইহারই মধ্যে সাইকেল দুটি অদৃশ্য হইয়াছে।

বোকার মত চাহিয়া রহিলাম।

দূরে টিং টিং করিয়া সাইকেলের ঘন্টি বাজিল, একটু মিষ্ট হাসির আওয়াজ ভাসিয়া আসিল। উহারা কি ওত পাতিয়া ছিল? আমি যে পাহারা দিতেছি তাহা জানিতে পারিয়াছে? আমার ঘাড়ের রোঁয়া আবার কাঁটা দিয়া উঠিল।

কিন্তু ছাড়িব না। একবার বোকা বনিয়াছি, দ্বিতীয়বার বোকা বনিব না। যখন সাইকেল লইয়া গিয়াছে তখন নিশ্চয় ফিরাইয়া দিতে আসিবে।

বামনরাওয়ের দরজার ওপর চোখ রাখিয়া বসিয়া রহিলাম। একটা বাজিল। একটু সজাগ হইয়া বসিলাম। দু'টো বাজিল। এখনও সাইকেলের দেখা নাই। মাঝে মাঝে মনটা খালি হইয়া যাইতেছে, চোখ দু'টা জুড়িয়া আসিতেছে—

চোখে কিছু দেখিলাম না, কানেও কিছু শুনিলাম না, হঠাৎ পঞ্চইন্দ্রিয় সতর্ক ভাবে সজাগ হইয়া উঠিল।

সাইকেল দু'টা চুপিচুপি বামনরাওয়ের দ্বারের দিকে যাইতেছে। নিঃশব্দে তাহারা পরস্পরের গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইল; টুং করিয়া একবার ঘন্টির মৃদু শব্দ হইল। তারপর আর কোনও সাড়াশব্দ নাই। যাহারা সাইকেল চড়িয়া আসিয়াছিল তাহারা চলিয়া গিয়াছে।

পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট কাটিয়া গেল।

তন্দ্রাবশে ছুটিয়া গিয়াছি, নিষ্পলক চক্ষে সাইকেল মার্টের পানে

চাহিয়া আছি···খুট করিয়া শব্দ হইল। দরজা একটু খুলিয়া বামনরাও গলা বাড়াইয়া এদিক ওদিক দেখিল, তারপর একে একে সাইকেল দু'টি তুলিয়া ভিতরে লইয়া গেল।

দরজা আবার বন্ধ হইল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে সাইকেল মার্টে গেলাম। বামনরাও একলা ছিল। তাহাকে বলিলাম, 'বামনরাও, কাল রাত্রে আমি সব দেখেছি।'

বামনরাওয়ের মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল, কী! কি দেখেছ কাকা?'

বলিলাম, 'যতটুকু চোখে দেখা যায় দেখেছি। অশরীরী ওরা কারা? আমি জানতে চাই।'

বামনরাও ভীত স্বরে বলিল, 'কাকা. একথা কাউকে বোলো না। জানাজানি হলে ওরা আর আসবে না। ওরা ভারি পয়মন্ত, ওরা যদি না আসে, আমার দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।'

'বেশ, কাউকে বলব না। কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে বলতে হবে!'

বামনরাও কিছুক্ষণ ঘাড় নিচু করিয়া ভাবিল। শেষে অনিচ্ছাভরে বলিল, 'আজ রাত্রে দোকান বন্ধ করবার পর তুমি এসো। তখন বলব।'

সে-রাত্রে বন্ধ দোকানঘরে বসিয়া বামনরাওয়ের কাহিনী শুনিলাম। কাহিনীতে চমকপ্রদ নূতনত্ব কিছু নাই, কালে কালে দেশে এরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে; যৌবনের কাছে মানুষের সংঘবদ্ধ বিষয়বুদ্ধি পরাভূত হইয়াছে। আমরা যখন মানুষের দুঃখদুর্দ্দশা দীনতার কথা চিন্তা করি তখন ভুলিয়া যাই, মানুষ কোনও দিন জীবনের কাছে মাথা হেঁট করে নাই, সে চিরদিন অপরাজিত।

বামনরাও বলিল, "বছর তিনেক আগেকার কথা। আমি তখন এখানে নতুন দোকান খুলেছি। সাইকেলের দোকানের পক্ষে জায়গাটা ভাল। কাছেই এস্ পি কলেজ, অনেক ছেলেমেয়ে সেখানে পড়ে। বেশীর ভাগ তারাই সাইকেল ভাড়া নিয়ে আমার দোকান চালু রেখেছে—"

এই পর্যন্ত বলিয়া বামনরাও থামিল, উৎকর্ণ হইয়া যেন কি শুনিল। তারপর বলিল. 'একটু বসো, আমি আসছি—'

সে দরজা খুলিয়া ছুইটি সাইকেল বাহিরে রাখিয়া আসিল; একটি মেয়েদের সাইকেল, একটি পুরুষদের।

বাহিরে তখন নিশুতি হইয়া গিয়াছে।

বামনরাও ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

তাহার স্ত্রী দুই বাটি গরম চা রাখিয়া গেল। একটি বাটি আমার দিকে ঠেলিয়া দিয়া এবং অন্যটি নিজের কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বামনারও আবার বলিতে শুরু করিল।—

'এস্. পি কলেজে একটি ছেলে পড়ত, তার নাম মধুকর। বোধ হয় উঁচু ক্লাসে পড়ত, আমি যখন তাকে দেখি তখন তার বয়স একুশ-বাইশ। চমৎকার চেহারা, টক্‌টকে রঙ, লম্বা ছিপছিপে গড়ন। মারাঠীদের মধ্যে এমন দেখা যায় না, যেন ময়ূর-বাহন কার্তিক। খুব ভাল ক্রিকেট খেলতে পারত।

'আমি দোকান খোলবার পর মধুকর প্রায়ই আসত। তার নিজের সাইকেল ছিল না, হেঁটে কলেজে আসত। কোথাও বেড়াতে যাবার ইচ্ছে হলে আমার কাছ থেকে সাইকেল ভাড়া নিয়ে যেত। কত ছেলেই তো আসে, কিন্তু মধুকরের চেহারায় এমন একটি মিষ্টতা ছিল, ব্যবহারে এমন শান্ত ছেলেমানুষী ছিল যা সচরাচর চোখে পড়ে না। বড় বংশের ছেলে, চিৎপাবন ব্রাহ্মণ, কিন্তু শরীরে এতটুকু অহঙ্কার ছিল না।

'একদিন মধুকরের সঙ্গে একটি মেয়ে এল। সম্প্রতি স্কুল থেকে পাস করে কলেজে ঢুকেছে। ছোটখাটো মেয়েটি, বয়স বড়জোর সতের; মধুকরের মত সুন্দর নয়, কিন্তু ভারি মিষ্টি নরম চেহারা। নাম মালতী।

'মধু আর মালতী দু'টি সাইকেল নিয়ে চলে গেল। এদেশে পর্দা নেই, কোনো দিন ছিল না; উত্তর ভারতের ওই ম্লেচ্ছ বর্বরতা মারাঠাদেশ কখনো স্বীকার করে নেয়নি। আমাদের ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে স্কুল-কলেজে পড়ে, একসঙ্গে খেলাধুলো করে। এখানে ছেলেমেয়েরা চোখাচোখি হলেই প্রেমে পড়ে না; কিন্তু যখন সত্যিই প্রেমে পড়ে তখন মা-বাপকে গিয়ে বলে, মা-বাপ বিয়ে দেন। একটি ছেলে

আর একটি মেয়ে একসঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখলে কেউ কিছু মনে করে না, টিপ্পনিও কাটে না।

'যাহোক, মধু আর মালতী মাঝে মাঝে আসে, সাইকেল নিয়ে বেড়াতে বেরোয়, আবার সন্ধ্যার পরেই সাইকেল ফেরত দিয়ে যায়। অন্য ছেলেমেয়েরাও আসে। কাছে-পিঠে অনেক খোলা জায়গা আছে; যেখানে একটু সবুজ ঘাসের টুকরো পায় সেখানে বসে হু'দণ্ড গল্পসল্প করে, তারপর যে-যার ঘরে ফিরে যায়।'

বামনরাও চুপ করিল, উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, তারপর নিম্নস্বরে বলিল, 'ওরা সাইকেল নিয়ে গেল—

আমার কৌতূহল হইল; দ্বার খুলিয়া উঁকি মারিলাম। সাইকেল হু'টা সত্যই অদৃশ্য হইয়াছে।

ফিরিয়া আসিয়া বসিলে বামনরাও বলিল, 'যাহোক, তারপর শোন— একদিন অন্য হু'টি কলেজের ছেলে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে শুনতে পেলাম। মালতীও খুব বনেদী ঘরের মেয়ে, কিন্তু হুই বংশে ভীষণ শত্রুতা। আজকের শত্রুতা নয়, সেই পেশোয়াদের আমল থেকে চলে আসছে। সেকালে হুই পক্ষের রাস্তা-ঘাটে দেখা হলে ছোরাছুরি চলত, এখন হু'পক্ষ মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। তারা যদি জানতে পারে মধু আর মালতী একসঙ্গে সাইকেল চড়ে বেড়াতে যায়, কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হবে।

'কিছু দিন পরে দেখলাম মধু আর মালতী সাবধান হয়েছে। একসঙ্গে দোকানে আসে না; সন্ধ্যের পর মধু হু'খানা সাইকেল নিয়ে যায়, মালতী বোধ হয় আড়ালে কোথাও লুকিয়ে থাকে। তারপর সকলের চোখ এড়িয়ে হু'জনে বেরোয়। ওদের বাড়ির লোকেরা বোধ হয় কিছু সন্দেহ করেছিল।

'একদিন রাত্রি সাড়ে আটটার সময় তারা সাইকেল ফেরত দিতে এসেছে। হু'জনের মুখ তৃপ্তিতে ভরা। মালতী একবার মধুকরের মুখের পানে তাকাল। সেই চাউনি দেখে বুঝতে পারলাম, এ শুধু যুবক-যুবতীর মধ্যে সহজ বন্ধুত্ব নয়, মালতীর বুক মধুতে ভরে উঠেছে।

'—কাকা, আমার বয়স হয়েছে, ভালবাসাবাসির ব্যাপার অনেক দেখছি। দু'টি ছেলেমেয়ের মধ্যে ভালবাসা হল তারপর যখন তারা দেখল বিয়ে হবার নয় তখন দু'চার দিন কান্নাকাটি করল, মন খারাপ করে রইল। ক্রমে আবার সব ঠিক হয়ে গেল। এ কিন্তু সে জিনিস নয়। এ একেবারে জীবন-মরণের ব্যাপার। মধু আর মালতী প্রাণ দেবে তবু পরস্পরকে ছাড়বে না।

'হঠাৎ একদিন ওদের যাওয়া-আসা বন্ধ হয়ে গেল। দশ দিন আর মধুর দেখা নেই। তারপর একদিন দুপুরবেলা মধু এল, বলল, একটা সাইকেল দাও একটু ঘুরে আসি।

'দেখলাম, তার মুখ-চোখ শুকনো, চুল রুক্ষ, যেন কতদিন স্নান করেনি, খায়নি।

'আমি বললাম, একটা সাইকেল?

'সে বলল, হ্যাঁ, মালতীকে ওরা কলেজ থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে, ঘরে বন্ধ করে রেখেছে।

'মধু দুই হাত মুঠি করে কিছুক্ষণ ঘোলাটে চোখে চেয়ে রইল, তারপর সাইকেল না নিয়েই চলে গেল।

'তিন-চারদিন পরে বর্ষার বৃষ্টি নেমেছে। পুণার বৃষ্টি মুষলধারে বড় হয় না। রিম-ঝিম্ রিম-ঝিম্; চারিদিক ঠাণ্ডা। আমার দোকানে রাত্রি ন'টার মধ্যেই খদ্দের আসা বন্ধ হয়ে গেছে। আন্দাজ সাড়ে ন'টার সময় আমি দোকান বন্ধ করে শুতে যাচ্ছি, দরজায় ঠক্ ঠক্ টোকা পড়ল। দোর খুলে দেখি—মধু আর মালতী।

'দু'জনের জামা-কাপড় ভিজে, চোখে মুখে বাঁধন-ছেড়া উল্লাস। মধু বলে উঠল, বামনরাও, মালতীকে দোতলার ঘরে বন্ধ করে রেখেছিল। ও ব্যাল্‌কনি থেকে বিছানার চাদর ঝুলিয়ে নেমে এসেছে।

'কী ডাকাত মেয়ে! মালতীর দিকে চেয়ে দেখলাম, তার মাথার চুল ভিজে, মুখে বিন্দু বিন্দু জলের ছিটে লেগেছে, কাপড়-চোপড় একটু এলোমেলো। সে মুখ টিপে হাসছে

'আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, পালিয়ে এসেছে! তারপর?

'মধু বলল, তারপর আর কী? একটু বেড়িয়ে-চেড়িয়ে আবার নিজের ঘরে উঠে শুয়ে থাকবে, কেউ জানতে পারবে না। মধু জোরে হেসে উঠল—দাও, দাও, শিগ্‌গির সাইকেল দাও।

'অ্যাঁ! এই বর্ষার রাতে বেড়াতে বেরুবে!

'বর্ষা কই? এর নাম কী বর্ষা! দাও সাইকেল।

ত্ব'জনে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হল আমিও ওদের প্রেমের ষড়যন্ত্রে শরিক হয়ে পড়েছি।

'তারপর বার তিনেক ওরা সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছিল। আমি দোকান বন্ধ করবার পর এসে দোরে টোকা দিত, সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যেত; ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে সাইকেল রেখে বাড়ি ফিরে যেত।

'আমি ওদের দেখতাম আর ভাবতাম—কী তুঃসাহসী ওরা! একবার যদি ধরা পড়ে তাহলে আর রক্ষে থাকবে না। এ রকম ব্যাপারে মেয়ে-পক্ষেরই অপমান বেশী, ওরা যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে মধুকে প্রাণে বাঁচতে হবে না।

'হলও তাই। এ ব্যাপার বেশীদিন চলল না। একদিন রাত্রি এগারোটার সময় আমার দোরে ধাক্কা পড়ল। দোর খুলে দেখি মধু আর মালতী—ত্ব'জনেরই দিশাহারা অবস্থা।

'মধু বলল, বামনরাও, শিগ্‌গির সাইকেল দাও, ওরা জানতে পেরেছে।

'বললাম, সে কি! এত রাত্রে তোমরা কোথায় যাবে?

'তা জানি না—

'এই সময় দূরে মোটর-বাইকের ফট্‌ ফট্‌ শব্দ শোনা গেল। মালতী চমকে উঠে বলল, ওই দাদা আসছে!

'ওরা আর দাঁড়াল না, ত্বটো সাইকেল নিয়ে বিত্যুতের মত বেরিয়ে গেল।

'আমি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করতে গেলাম, কিন্তু তার আগেই মোটর-বাইক এসে দোকানের সামনে থামল। আরোহী চড়া গলায়

আমাকে জিজ্ঞেস করল—একটা মেয়ে আর একটা ছেলে এখান থেকে সাইকেল নিয়ে গেছে?

'আমি ঢোক গিলে বললাম, হ্যাঁ।

'সে প্রশ্ন করল, কোন্ দিকে গেছে?

'বললাম, তা দেখিনি।

'লোকটা লাফিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

'তার কোমরে একটা খাপসুদ্ধ ছোরা গোঁজা রয়েছে। ভারি জোয়ান চেহারা কিন্তু মুখের আদল থেকে চেনা যায়, মালতীর দাদা। সে আমাকে ধমক দিয়ে বলল--তুই নিশ্চয় জানিস। বল্ তারা কোথায় গেছে।

'কাকা, আমি মারাঠী, মিষ্টি কথার গোলাম; কিন্তু চোখ রাঙিয়ে আমাকে কেউ ভয় দেখাতে পারে না। আমি একটা স্প্যানার তুলে নিয়ে বললাম, যাও আমার দোকান থেকে নইলে মাথা ফাটিয়ে দেব।

'এই সময় আর একটা মোটর-বাইক এসে দাঁড়াল। তার আরোহী ডেকে বলল, জয়ন্ত! খবর পেয়েছি, ওরা সিংহগড়ের দিকে গেছে।

'মালতীর ভাই একলাফে গিয়ে নিজের মোটর-বাইকে বসল।

'দুটো মোটর-বাইক গর্জন করে ছুটে বেরিয়ে গেল।

'সে-রাত্রে আমি আর কিছু দেখিনি।

'পরে জানতে পেরেছিলাম, মধু আর মালতী সিংহগড় পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তারা যখন খড়্গবৎসলার হ্রদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় পিছনে মোটর-বাইকের গর্জন শুনতে পায়, তারা সাইকেলসুদ্ধ হ্রদে লাফিয়ে পড়েছিল।—'

বামনরাও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

আমিও ভাবিতে লাগিলাম, এ ছাড়া এ গল্পের অন্য পরিণতি কি ছিল না? যাহারা পরস্পরকে একান্ত ভাবে চায় তাহারা ব্যর্থ হইয়া আত্মহত্যা করে কেন? প্রেম কি তবে একটা সাময়িক উন্মাদনা? কিংবা সংসার এত প্রেম পছন্দ করে না তাই তাহার এই পরিণাম?

কিন্তু গল্প এখনও শেষ হয় নাই। বলিলাম, তারপর?

বামনরাও একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চোখ তুলিল।

'তারপর দিন দশেক কেটে গেল। ওদের মৃত্যু নিয়ে শহরে বেশ হৈচৈ হয়েছিল, তাও ক্রমে নিভে এল। দু'টি অপরিণত-বুদ্ধি ছেলে-মেয়ের হঠকারিতার কথা কে বেশীদিন মনে করে রাখে! দৈনিক কাগজে খানিক লেখালেখি হল, সাপ্তাহিক পত্রিকায় কবিতা বেরুল তারপর সব চুপচাপ।

একদিন বেশ বর্ষা নেমেছে, আমি দশটার মধ্যেই দোকানপাট বন্ধ করে শুয়ে পড়েছি। তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় দোরে খুট খুট শব্দ হল। তন্দ্রা ছুটে গেল, আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। ঠিক মধু যেভাবে টোকা দিত সেই টোকা। কিছুক্ষণ চুপ করে বিছানায় বসে রইলাম। আবার টোকা পড়ল। তখন উঠে দরজা খুললাম।

বাইরে কেউ নেই! টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে, জনমানুষ নেই। দরজা বন্ধ করে যেই পিছু ফিরেছি অমনি আবার টোকা পড়ল। আবার দরজা খুললাম···কেউ নেই। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

এইরকম বার পাঁচেক হবার পর বুঝতে পারলাম। ওরা এসেছে, সাইকেল চায়। দুটো সাইকেল বাইরে রেখে দোর বন্ধ করে দিলাম। আর টোকা পড়ল না। দশ মিনিট পরে দরজা খুলে সন্তর্পণে গলা বাড়ালাম, সাইকেল অদৃশ্য হয়েছে। ঘণ্টাখানেক বাদে বাইরে কিড়িং শব্দ হল।

দোর খুললাম। সাইকেল ফিরে এসেছে।

'সেই থেকে প্রায় রোজ এই ব্যাপার চলছে। তুমি নিজের চোখে দেখে ফেলেছ, তোমার কাছে লুকোবার চেষ্টা বৃথা। আমি আর আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ জানে না। ওরা ভারি পয়মন্ত দু'দিন না এলে আমার খদ্দের কমে যায়। কাকা, তুমি কাউকে বলো না।'

'বলব না', বলিয়া আমি উঠিলাম।

এই সময় বাহিরে সাইকেলের মৃদু ঘন্টি বাজিল—কিড়িং।

আমি বামনরাওয়ের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। সে গিয়া দ্বার খুলিল। দেখিলাম, সাইকেল দু'টি পরস্পরের গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।



পুষ্করা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তর্করত্ন কালীপুজোয় বসেছিলেন।

শুক্লা চতুর্দশীর রাত। আশ্বিনেব জ্যোৎস্নাশুভ্র আকাশ, কোথা থেকে রাশি রাশি কালো মেঘ এসে সে শুভ্রতাকে আচ্ছন্ন কবে দিয়েছে। সন্ধ্যায় নদীর যে জল গলানো রূপোর মতো ঝলমল করছিল, তার রঙ এখন কালো আর পিঙ্গলে মিশে যেন হিংস্রতাব রূপ নিয়েছে। আর একবার খানিকটা কারণ গলাধঃকরণ করে তর্করত্ন ভয়ার্ত বিহ্বল চোখে তাকালেন। ওপারেব বন-জঙ্গলগুলো রাশি রাশি বিচ্ছিন্ন আর আকারহীন বিভীষিকার মতো জেগে রয়েছে। বাতাসে শীতের আভাস, তর্করত্নেব মনে হল তবুও তাঁর সমস্ত শরীরের মধ্যে আগুন জ্বলছে, রোমকূপের রন্ধ্রপথে আগুনের কণার মতো বেরিয়ে আসছে ঘামের বিন্দু।

শুক্লা চতুর্দশী রাতে কালী পুজো -কথাটা শুনতে অশোভন আর অশাস্ত্রীয় ঠেকছে। কিন্তু এ সাধারণ কালীপুজো নয়। আশেপাশে দশখানা গ্রাম জুড়ে মড়ক দেখা দিয়েছে, কলেরার মড়ক। আর সে কি মৃত্যু! ছ মাসের শিশু থেকে ষাট বছবের বুড়ো - দিব্যি আছে, কোনো রোগব্যাধির বালাই নেই, হঠাৎ কাটা কই মাছের মতো ধড়ফড় করে মরে যাচ্ছে। তাই দেবীর কোপ শান্ত করবার জন্যে শ্মশানে

শ্মশান-কালী পুজোর আয়োজন। অসহায় বিপন্ন মানুষ তিথি-নক্ষত্রের দোহাই মানে না।

পাশেই একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। তার শাদা দীপ্তিটা কেমন নীলাভ হয়ে আসছে, তেল ফুরিয়ে গেছে বোধ হয়। আলোটার ওপরে-নীচে নানাজাতের ছোট বড় পোকা এসে জমেছে স্তূপাকারে। তারই অদূরে বসে কাশী কুমোর গাঁজা খাচ্ছে আর গায়ের ওপর থেকে পোকা তাড়াচ্ছে ক্রমাগত।

মুখ থেকে গাঁজার কলকে নামিয়ে কাশী কুমোর বললে, এল ?

অসহায় কাতর দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে তর্করত্ন বললেন, নাঃ, কোনো পাত্তাই তো দেখছি না।

কাশী বললে, রাত তো প্রায় কাবার। ভোগ হয়ে গেছে কতক্ষণ। ও আজ আর আসবে না।

—আসবে না ? আসবে না মানে ?—বীরাসনে বসেও রক্তবস্ত্রধারী তর্করত্নের আপাদমস্তক থর থর করে কেঁপে উঠল।

—না এলে কী হবে জানিস ? পুষ্করা পাবে। কারো রক্ষা থাকবে না, তোর নয়, আমার নয়—শ্মশানকালীর খাঁড়ায় কেটে কুটে একজাই হয়ে যাবে সমস্ত। একটি মানুষেরও আর বাঁচবার জো থাকবে না।

কাশী কুমোরের হাত থেকে গাঁজার কলকে খসে পড়ে গেল।

—ডাকো না ঠাকুর, ভালো করে মাকে ডাকো। এতকাল পুজো-আচ্চা করলে, এতবড় পণ্ডিত তুমি, আর দেবীকে ভোগ খাওয়াতে পারলে না ? ডাকো, ডাকো, প্রাণপণে ডাকো।

শুক্‌নো মুখে তর্করত্ন বললেন, ডাকছি তো, কিন্তু—

একটু দূরে আধো অন্ধকারের মধ্যে বড় একখানা কলাপাতায় স্তূপাকারে লুচি সাজানো আর খানিকটা মাংস। তার ওপরে বড় একটা জবাফুল, পেট্রোম্যাক্সের আলোতে চাপবাঁধা খানিকটা রক্তের মতো দেখাচ্ছে। সেদিকে দুখানা হাত বাড়িয়ে দিয়ে তর্করত্ন আবেগ-ভরা কম্পিত গলায় মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন, দেবি, প্রসন্ন হও। তোমার ভোগ গ্রহণ করো, জগৎকে রক্ষা করো—

কিন্তু কোথায় দেবী !

নিশিরাত্রের শ্মশান। শুধু শ্মশান বললে কম বলা হয়, এ মহাশ্মশান। অগভীর আর পঙ্কস্রোতা নদীর ধারে ধারে প্রায় তিন মাইল জুড়ে এই শ্মশান ছড়িয়ে পড়ে আছে, কত যে মড়া এখানে পুড়তে আসে তার হিসেব দেওয়া দুঃসাধ্য। আধপোড়া হাড়, মানুষের মাথা, চিতার কয়লা, পোড়া বাঁশ আর রাশি রাশি ভাঙা কলসী। প্রতি বছর বানের সময় নদী পাড় ভাঙে, মুছে নিয়ে যায় অসংখ্য চিতার অঙ্গার-চিহ্ন, মড়ার মাথা আর পোড়া হাড়ের টুকরোয় তার গর্ভ ভরাট হয়ে ওঠে। তার পরেই আবার নতুন চিতা জ্বলে, লক্‌লকে আগুনের শিখা প্রতিফলিত হয় অস্বাস্থ্যকর লালচে জলের ওপর, শ্মশান ক্রমশ এগিয়ে আসে লোকালয়ের কোল পর্যন্ত। আগে যেখানে মড়া নিয়ে যেতে হলে তিনখানা পর পর পোড়ো জমির মাঠ পেরিয়ে যেতে হত, এখন সেখান থেকে হরিধ্বনি দিলে গ্রামের ঘরে ঘরে তার সাড়া জেগে ওঠে।

তর্করত্ন পেছন ফিরে তাকালেন। নিঃশব্দ ঘুমন্ত গ্রাম। আতঙ্কে মূর্ছিত—মৃত্যুতে অসাড়। যে বাড়িতে সাতটি লোক ছিল তার চারটিই হয়তো মরে শেষ হয়ে গেছে, একজনের হয়তো ভেদবমি ধরেছে আর বাকী দুজন খুব সম্ভব শহরে পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে। শুক্লা চতুর্দশীর রাতকে কালো মেঘে অমাবস্যার মুখোশ পরিয়েছে—এক কোণে থেকে থেকে বিদ্যুতের সর্পিল চমক ; একটা নিষ্ঠুর রক্তাক্ত হাসির মতো নদীর কালো জলকে উদ্ভাসিত করে দিচ্ছে।

—দেবী, প্রসীদ, প্রসীদ—

কাতর আর্তকণ্ঠে তর্করত্ন আহ্বান করছেন। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে চলেছে রাত্রির প্রহর, একপাশে রাখা টাইম-পীস্‌টার কাঁটা ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছে আড়াইটের ঘরে। তর্করত্নের হৃৎপিণ্ডে উচ্ছলিত রক্তের স্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে যেন ঘড়ির কাঁটায় তাল পড়ছে—টিক্ টিক্ টিক্। রাত যদি ভোর হয়ে যায়, দেবী যদি শিবাভোগ গ্রহণ না করেন, তা হলে—তা হলে—তর্করত্ন আর ভাবতে পারছে না! অনিবার্য পুষ্করা। আর তার ফলে শুধু এই গ্রাম নয়, সমস্ত দেশ শ্মশানকালীর কোপে

শ্মশান হয়ে যাবে। পুরোহিত, কুমোর কারো রক্ষা নেই। টাকার লোভে বিদেশে এসে শেষে তাঁর সর্বনাশ হয়ে গেল!

গাঁজার ঝোঁকে কাশী কুমোর ঝিমুচ্ছে। কেশব ঢুলী ঢাকের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। এ অবস্থায় কেমন করে ওরা ঘুমুচ্ছে—আশ্চর্য! গ্রামের দিক থেকে মাঝে মাঝে এক একটা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে—নিজের রক্তের মধ্যেও যেন তর্করত্ন শুনতে পাচ্ছেন সেই কান্নার প্রতিধ্বনি। বাতাসে পচা মড়ার গন্ধ ভাসছে—মুখে আগুন ছুঁইয়েই গ্রামের লোক মড়া ফেলে গেছে এখানে ওখানে। নদীর দুর্গন্ধ আবদ্ধ জলে সাদা মতন ওটা কী ভাসছে; একটা মানুষ যে অমন অতিকায়ভাবে ফুলে উঠতে পারে এ যেন কল্পনাই করা যায় না! ঝোপে-ঝাপে শেয়ালের ডাক উঠেছে, আর তার জবাব দিচ্ছে মড়াখেকো শ্মশানকুকুরের একটানা কান্নার মতো অস্বাভাবিক আর্তনাদ!

চারিদিকে এত শেয়াল, অথচ দরকারের সময় একটার দেখা নেই!

শিবাভোগ। শেয়াল এসে ভোগ গ্রহণ না করলে পূজো ব্যর্থ হয়ে যাবে। তর্করত্ন বৈজ্ঞানিক যুগের চিন্তাধারার মানুষ নন; তিনি শাস্ত্র বিশ্বাস করেন, দেবীর মাহাত্ম্যে বিশ্বাস করেন। সারাজীবন এই করেই তাঁর কেটেছে। পণ্ডিত বলে তাঁর খ্যাতি আছে, নানা জায়গা থেকে ক্রিয়াকর্মে তাঁর ডাক আসে; বাঙলা দেশের বহু বড়লোকের বাড়ি থেকে সসম্মানে বিদায় পান তিনি। তিনশো টাকা দক্ষিণার লোভ দেখিয়ে গ্রামের সমৃদ্ধ মহাজন আর তালুকদার বলাই ঘোষ তাঁকে ডেকে এনেছে দেবীর কোপ শান্ত করবার জন্যে। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর নিজের হাতে কামড় খেতে ইচ্ছে করছে, সমস্ত চেতনা চিৎকার করে কেঁদে উঠতে চাচ্ছে। এমন বিপদে তিনি জীবনে আর পড়েন নি।

বলাই ঘোষও সামনে নেই। তাঁকে পুজোয় বসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে বাড়িতে গিয়ে বোধ হয় ঘুম লাগিয়েছে। হয়তো ভেবেছে আর ভাবনা নেই! তর্করত্নের মতো সিদ্ধপুরুষ, পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসে যিনি দৈনন্দিন কালী পুজো করেন, তিনি অনায়াসেই গ্রাম থেকে সমস্ত মড়ক আর আধিব্যাধির বালাই দূর করে দিতে পারবেন। কিন্তু তর্করত্ন যে কী

সর্বনাশের সামনে দাঁড়িয়ে বলির পশুর মতো কাঁপছেন, একথা বলাই ঘোষের ভাববারও ক্ষমতা নেই। একবার বলাই ঘোষকে সামনে পেলে —তর্করত্ন হিংস্রভাবে ভাবতে লাগলেন—বলাই ঘোষকে সামনে পেলে তিনি পৈতে ছিঁড়ে অভিশাপ দিতেন: সবংশে দেবীর উদরে যাও তুমি, তুমি উচ্ছন্নে যাও!

ঝিমুতে ঝিমুতে কাশী কুমোর হঠাৎ যেন চমকে উঠল।

—কী ঠাকুর, কী খবর?

—খবর আবার কী? যা কপালে আছে, তাই হবে।—কথার শেষদিকটা কান্নায় কাঁপতে লাগল।

—শেয়াল এল না?

— নাঃ।—তর্করত্নের চোখে এবার অশ্রু ছলছল করে উঠল।

—ও আর এসেছে। কত মড়া পাচ্ছে খেতে, খিদে তেষ্টা তো নেই। আর তাজা মানুষের রক্তেই দেবীর পেট ভরছে। তোমার ওই শুকনো চিম্‌সে লুচি আর পোয়াটাক্ বোকা পাঁঠার মাংস খেতে তো বয়েই গেছে তাদের।

—তুই থাম হারামজাদা—বজ্রকণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠলেন তর্করত্ন: যা বুঝিসনে, তার ওপর কেন কথা কইতে যাস?

হে-হে-হে—নির্বোধ শব্দ করে কাশী কুমোর হেসে উঠল। গাঁজার নেশায় তার ভয়-ডর ভেঙে গেছে। আচ্ছা, থামলাম। ন্যাংটোর আবার বাটপাটপাড়ের ভয়! আমার তো সবই ওলা-দেবীর পেটে গেছে। বউ ব্যাটা সমস্তই। পুষ্করাই লাগুক আর ঘোড়ার ডিমই লাগুক—ওতে আমার কী হবে ঠাকুর।

তা বটে, তার কিছুই হবে না। কিন্তু তর্করত্নের তো তা নয়। তাঁর ঘর আছে, সংসার আছে, ছেলেপিলে আছে। তিনি মরলে তাদের খেতে দেবে এমন কেউ নেই। তিনশো টাকা তাদের বাঁচিয়ে রাখবে কদিন। আর এই দুর্ভিক্ষের বাজার। মৃত্যু যেন চারদিক থেকে কালো কালো হাত বাড়িয়ে মানুষকে তেড়ে আসছে—একেবারে সমস্ত গ্রাস

না করে তার ক্ষিদে আর মিটবে না। না খেয়ে মরছে, খেয়ে কলেরা হয়ে মরছে। পুষ্করার বাকী আছে কোথায়।

সামনে কালী মূর্তি। কাঁচা কালো রঙ জ্বলজ্বল করছে, ঘামের মতো টপটপ করে তার দু-এক বিন্দু ঝরে পড়ছে দেবীর পায়ের তলায়—মহাদেবের সমস্ত মুখে এঁকে দিয়েছে বিষাক্ত ক্ষতের চিহ্ন। সমস্ত মূর্তিটা যেন জীবন্ত—চোখ দুটো রক্তে মাখা। এ মূর্তিও সাধারণ নয়, তৈরী করতে হয় শ্মশানে, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হয় শ্মশানচিতার কয়লা, তারপর রাতারাতি বিসর্জন দিতে হয়। তাড়াতাড়িতে তৈরী করতে গিয়ে কাশী কুমোর দেবীর মূর্তিকে ঠিক দেবী করে গড়ে তুলতে পারেনি, সবটা মিলিয়ে একটা পৈশাচিক বীভৎসতার সৃষ্টি হয়েছে। পেট্রোম্যাক্সের আলোয় তার একটা দীর্ঘ ছায়া পেছনে নদীর জলে গিয়ে পড়েছে স্রোতের টানে সেই ছায়াটা কাঁপছে—পচা মড়ার দুর্গন্ধে যেন নিশ্বাস আটকে আসছে তর্করত্নের।

কাশী কুমোর আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। ঢোলের ওপর মাথা রেখে নাক ডাকাচ্ছে কেশব ঢাকী। কী আশ্চর্য রকমে নিশ্চিন্ত হয়ে আছে ওরা। সমস্ত শ্মশান, সমস্ত দিক-প্রান্তর যেন কার মন্ত্রবলে স্তব্ধ হয়ে গেছে। শেয়াল ডাকছে না—গ্রামের দিক থেকে মড়া-কান্নাটা গেছে থেমে। শুধু মাথার ওপর শুক্লা চতুর্দশীর আকাশ মেঘের ভারে আচ্ছন্ন হয়ে আতঙ্কে যেন থমথম করছে।

হাওয়ায় অল্প অল্প শীতের আমেজ। পরনের খাটো রক্তবস্ত্রে শরীরে সবটা ঢাকা পড়ছে না। ভয়ের সঙ্গে শীতের শিহরণ মিশে গিয়ে তর্করত্ন কাঁপতে লাগলেন, কম্পিত কণ্ঠে মন্ত্র উচ্চারিত হতে লাগল: দেবি, প্রসীদ, প্রসীদ—

দূরে কলাপাতার ওপর শিবাভোগ শীতের স্পর্শে ঠাণ্ডা আর বিবর্ণ হয়ে আসছে। আর একপাত্র তীব্র কারণ গলায় ঢেলে নিলেন তর্করত্ন, মুহূর্তে সর্বাঙ্গে আগুন ধরে গেল। দেবী আসবে না? নিশ্চয় আসবে, আসতেই হবে তাকে। সারাজীবন ধরে ঐকান্তিক নিষ্ঠাভরে দেবীর আরাধনা করছেন তিনি। সাধারণ পূজারী যেখানে এগিয়ে যেতে সাহস

করে না, সেই তান্ত্রিক পঞ্চমুণ্ডী আসনে বসে তিনি নিত্যপূজা করেন। তাঁর আহ্বান দেবীকে শুনতে হবে—শুনতেই হবে।

ঘড়ির কাঁটায় রাত তিনটে। তা হোক।

তর্করত্ন নিজের মধ্যে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন।

কতক্ষণ ধ্যান করছিলেন খেয়াল নেই, হঠাৎ এক সময়ে চম্‌কে জেগে উঠলেন তিনি। দপ-দপ-দপ। আকস্মিকভাবে খানিকটা উগ্র দীপ্তিতে শিখায়িত হয়ে উঠেই পেট্রোম্যাক্সটা নিবে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকের অন্ধকার যেন হুড়মুড় করে এসে ভেঙে পড়ল বিরাট একটা বন্যাস্রোতের মতো। গুঁড়োয় গুঁড়োয় জলের কণা ছড়িয়ে পড়ছে, বৃষ্টি নামলো নাকি?

উঠে আলোটা জ্বালাবার একটা প্রেরণা বোধ করার সঙ্গে সঙ্গে তর্করত্ন নিঃসাড় হয়ে গেলেন। বৃথা হয়নি, মিথ্যে হয়নি তাঁর সকাতর প্রার্থনা। দেবী এসেছেন। কালির মতো কালো অন্ধকারেও তর্করত্ন ভীত রোমাঞ্চিত দেহে দেখলেন শিবাভোগের সামনে দুটো চোখ আগুনের মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। দু হাতে সে শিবাভোগ গো-গ্রাসে খাচ্ছে, তার দাঁতে লুচি আর মাংস চিবোনোর একটা হিংস্র শব্দ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে তর্করত্নের কানে ভেসে এল।

কিন্তু দু হাতে? দু হাতে কি রকম? তর্করত্ন আবার তীব্র চমক অনুভব করলেন নিজের মধ্যে। শেয়ালের তো হাত থাকে না। তা লে—দেবী কি নিজের মূর্তি ধরেই তাঁর ভোগ গ্রহণ করতে এসেছেন?

নিজের মূর্তি ধরেই? ভয়ে যেমন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে যেন কোথা থেকে ঠেলে উঠল একটা দুঃসহ আনন্দের জোয়ার। সারাজীবন ধরে যে সাধনা তিনি করেছেন, আজ তা সম্পূর্ণ ার্থক হল। এই মহাশ্মশানে আর মৃত্যুর বিরাট উৎসবের মধ্যে দেবী এবার মূর্তি ধরেই নেমে এসেছেন। বিস্ফারিত চোখ মেলে তর্করত্ন খতে লাগলেন কী ক্ষুধার্তভাবে চোখদুটো জ্বলে উঠেছে। অন্ধকারের মধ্যে দৃষ্টি নিশাচরের মতো তীক্ষ্ণতা পেয়েছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এক

মাথা ঝাঁকড়া চুল, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ, অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি। তার দাঁতের চাপে হাড়গুলো মড় মড় করে ভেঙে যাচ্ছে।

শিউরে উঠে তর্করত্ন চোখ বুজবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না! কে যেন সে দুটোকে জোর করে টেনে ধরে রেখেছেন। কাশী কুমোর আর কেশব ঢুলী বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে ঘুমুক, দেবীকে স্বচক্ষে দেখবে এত পুণ্য ওরা করেনি। চারিদিকে রন্ধ্রহীন কালো অন্ধকার, পচা মড়ার গন্ধ, আকাশ থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় কালো বৃষ্টি গলে পড়ছে।

—দেবী, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। তোমার ভোগ গ্রহণ করো, মারীভীতদের রক্ষা করো। প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও—

ভীত শুক্‌নো গলায় উচ্চারিত হতে লাগল ক্ষীণ প্রার্থনা। কিন্তু এত নিঃশব্দে যে তর্করত্ন নিজেই তা শুনতে পেলেন না।

ঘড়ির কাঁটায় তাল পড়ছে—টিক্-টিক্ টিক্। তর্করত্নের বুকের মধ্যেও তার প্রতিধ্বনি। কালো অন্ধকারের পাষাণ প্রাচীর ভেদ করে সময় যেন এগিয়ে যেতে পারছে না, বার বার করে থমকে দাঁড়াচ্ছে। হাড় চিবোনোর শব্দটা তারই মধ্যে ক্রমাগত কানে আসছে। তর্করত্নের গলা শুকিয়ে আসছে, সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে যাচ্ছে। আর একবার একপাত্র কারণ খেয়ে নিতে পারলে মন্দ হত না। কিন্তু নড়বার সাধ্য নেই, কে যেন তাঁর সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে অসাড় আর অনড় করে দিয়েছে।

—হি-হি-হি—

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ হাসিতে সমস্ত শ্মশানটা থর থর করে কেঁপে উঠল। তার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে গেল দিক দিগন্তে। মরা নদীর জল আতঙ্কে কুঁকড়ে গেল, ওপারের ন্যাড়া শিমুল গাছে ডুকরে উঠল শকুনের বাচ্চা। তর্করত্নের হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে গলার কাছে উঠে এসেই আবার ধড়াস্ করে আছড়ে পড়ে গেল।

কাশী কুমোর আর কেশব ঢুলী চমকে জেগে আর্তনাদ করে উঠল। অমানুষিক ভয়ে বুজে-আসা চোখ দুটো খুলে তর্করত্ন দেখতে পেলেন, সে

মূর্তি অন্ধকারের মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেছে যেন দূর থেকে ভেসে আসছে একটা দ্রুত বিলীয়মান লঘু পদধ্বনি।

—জয় মা শ্মশানকালী, জয় মা—তর্করত্ন গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে উঠলেন—ওরে বাজা, বাজা। আর ভয় নেই, দেবী নিজে এসেছিলেন, তাঁর ভোগ নিজেই গ্রহণ করে গেছেন। বাজা—বাজা। জয় মা শ্মশানকালী জয় মা মহাকালী।

আবার পেট্রোম্যাক্সের আলো জ্বলে উঠল। শিবাভোগ নিঃশেষিত। এমন হাতে হাতে প্রত্যক্ষ ফল সচরাচর দেখা যায় না।

কেশব ঢুলী প্রাণপণে ঢাকে ঘা লাগাল। কারণের বাকীটুকু এক চুমুকে নিঃশেষ করলেন তর্করত্ন। কাশী কুমোর গাঁজার কলকেটা নতুন করে সাজতে বসল।

রাত ভোর হয়ে আসছে। সাড়ে চারটে। মাথার ওপর থেকে কালো মেঘ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে, তার একপাশ দিয়ে অস্তগামী চাঁদের উজ্জ্বল আলো এতক্ষণে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ল। যেন মৃত্যুর যবনিকা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে শ্মশানকালী প্রসন্ন হাসিতে হেসে উঠেছেন।

ভোরের আগেই এই অদ্ভুত ঘটনার কথা গ্রামের ঘরে ঘরে আলোড়ন জাগিয়ে দিলেন। শ্মশানকালী নিজে এসে ভোগ গ্রহণ করেছেন, কলিযুগে দেবীর এমন প্রত্যক্ষ আবির্ভাবের কথা আর শোনা যায় না। এখন আর ভয় নেই, এবার গ্রাম রক্ষা পাবে, দেশ রক্ষা পাবে। মারী থাকবে না, মন্বন্তর থাকবে না। মৃত্যুমগ্ন গ্রামের ওপর উল্লাসের তরঙ্গ জেগে উঠল। তর্করত্নের চোখ দিয়েও দরদর করে জল পড়তে লাগল। তার সাধনা এতদিনে সফল হয়েছে—দেবী এসে সশরীরে তাঁকে দর্শন দিয়েছেন।

বেলাবেলিই স্টেশনে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল তর্করত্নের। কিন্তু গ্রামের লোক তাঁকে যেতে দিলে না। বলাই ঘোষ তো গলায় কাপড় জড়িয়ে সারাদিনই তাঁর পদতলে পড়েই রইল। ধুলো দিতে দিতে পায়ের এক পর্দা চামড়াই উঠে গেল তর্করত্নের। আর সমবেত জনতার কাছে সত্যি-মিথ্যের রঙ চড়িয়ে ব্যাপারটা ফলাও করতে লাগল কাশী কুমোর।

—মাকে দেখবার পুণ্যি তো করিনি, তাই পাপচোখে কী মোহ-নিদ্রাটাই নেমে এল। সবই তাঁর লীলে। আর সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে মা নিজেই নেমে এসে শিবাভোগ খেলেন। গলায় মুণ্ডমালা, হাতে খাঁড়া, জিভ থেকে টক টক করে পড়ছে রক্ত। তারপর সে কি ভয়ানক হাসি! শুনলে যেন পেটের পিলে ফুসফুস একসঙ্গে চড়াৎ করে ফেটে যায়। চমকে তাকিয়ে দেখি—

সমবেত জনতার উদ্‌গ্রীব ভয়ার্ত মুখের দিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শুরু করলেন : চমকে তাকিয়ে দেখি—

সন্ধ্যার পরে তর্করত্ন গোরুর গাড়ীতে চেপে স্টেশনে যাত্রা করলেন। শেষরাতে ট্রেন ধরতে হবে। তারপর শহর।

গাড়ির অর্ধেকটা দানে আর দক্ষিণায় বোঝাই। কলা, মূলো, নারকেল, কাপড়—আরো কত কী। এদিক দিয়ে বলাই ঘোষের কার্পণ্য নেই, ধানের ব্যবসা করে সে মেলা টাকা কামিয়েছে এবারে। তা ছাড়া ঘোষপাড়া গ্রামটাই তালুকদার আর মহাজনের দেশ। যুদ্ধের বাজারে তারা মুঠো মুঠো টাকা কুড়িয়ে নিয়েছে। দক্ষিণার অঙ্কে তিনশো টাকার জায়গায় তারা পাঁচশো টাকা তুলে দিয়েছে তাঁর হাতে। তর্করত্ন প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছেন। পাঁচশো টাকা একটা কালী পুজোর দক্ষিণা! যুদ্ধে দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতি না হলে এমন কথা কি কেউ ভাবতে পারত।

অত্যন্ত প্রসন্ন মনে তর্করত্ন একটা বিড়ি ধরালেন। গাড়ী চলেছে মন্থর গতিতে। আজ কোজাগরী লক্ষ্মী-পূর্ণিমা। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ আলো করে দিয়ে চমৎকার চাঁদ উঠেছে। কালকের মেঘাচ্ছন্ন শ্মশানের সঙ্গে এর কত তফাৎ! শহরের অনেকগুলো লক্ষ্মী-পুজো আজ তর্করত্নের নষ্ট হয়ে গেল—তা যাক, বলাই ঘোষ অনেক বেশি পরিমাণে তার ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছে।

দুপাশে দূর-বিস্তৃত মাঠ। মাঠ উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় দিক দিগন্তে ধানের শীষ দুলছে—চমৎকার ফলন হয়েছে এবার। মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘ তালের গাছ প্রহরীর মতো কালো ছায়া ফেলছে। পথের

দুপাশে কাঠমল্লিকার ফুল যেন গন্ধের মায়া বিস্তার করে দিয়েছে। এখানে ওখানে গ্রাম; এত শস্য—এত জীবনের মধ্যেও মৃত্যু আর মন্বন্তরের স্পর্শে নিস্তব্ধ।

—হুঃ—হুঃ—হুঃ—

জিহ্বা-তালু সংযোগে একটা প্রবল শব্দ করে গাড়োয়ান গাড়িটাকে থামিয়ে দিলে।

—কী হল রে?

তর্করত্ন চমকে উঠলেন। এই নির্জন মাঠের মধ্যে—ডাকাত নয় তো? সঙ্গে পাঁচশো নগদ টাকা, বিস্তর জিনিসপত্র। বড় ভরসাও নেই।

—রাস্তার ওপর ডোমপাড়ার পাগলিটা পড়ে আছে বাবু।

—কে ডোমপাড়ার পাগলি? কী হয়েছে?

—ওই—গাড়োয়ানের স্বরে বেদনার আভাস লাগল: আকালে ওর তিনটে বেটা আর সোয়ামী না খেয়ে মরে গেছে বাবু। তাই পাগল হয়ে গেছে। রাস্তায় পড়ে কাতরাচ্ছে, যমে ধরেছে বোধ হয়।

তর্করত্ন সভয়ে গাড়ির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিলেন।

—থাক, থাক যেতে দে। পাশ দিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁকিয়ে চলে যা। যে রোগ, বিশ্বাস নেই বাবা।

গাড়ি চলতে লাগল। কোজাগরী পূর্ণিমার রাশি রাশি জ্যোৎস্না—সাঁওতাল পাড়ায় মাদলের মৃদু-গম্ভীর শব্দ, ওরাও কি লক্ষ্মীপুজো করে নাকি? কোজাগরী। লক্ষ্মী ঘরে ঘরে ডাক দিয়ে যান—কে জাগে? চাঁদের দুধে ধানের শীষ পূর্ণায়ত হয়ে উঠেছে। ফসলের ভরা ক্ষেতের মধ্যে থেকে থেকে একটি করে প্রদীপের শিখা। শস্য লক্ষ্মীকে আহ্বান করছে মাটির মানুষেরা, তাঁর পায়ের ছোঁয়া লেগে ক্ষেতের ধান সোনা হয়ে যাবে। কাঠ-মল্লি কার সুরভিতে কি তাঁরই শ্রী অঙ্গের পদ্মগন্ধ?

তর্করত্নের মনটা হঠাৎ বিহ্বল হয়ে উঠল। দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে তিনি গদ্‌গদ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, দোহাই শ্মশানকালী, কৃপা করো মা।

পুষ্করা কেটে যাক, মানুষ আবার বেঁচে উঠুক। মা মহাকালী, তুমি মহালক্ষ্মী হয়ে এসে দেখা দাও।

এত ধান, এত ফসল, পুষ্করা কেটে যাবে বইকি। কিন্তু একটা জিনিস তর্করত্ন বুঝতে পারেন নি। তাঁর শ্মশানকালী এসেছিল ওই ডোমপাড়ার পাগলিটার রূপ ধরেই—আর এখনো পথের ধুলোয় পড়ে সে মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে—কালীর মতো জিভ মেলে হাঁপাচ্ছে এক ফোঁটা জলের জন্যে। দীর্ঘদিনের বুভুক্ষার পরে দেবভোগ্য শিবাভোগ সে সহ্য করতে পারে নি।

কিন্তু তবুও পুষ্করা কেটে যাবে। মারী আর মড়কের সমস্ত বিষ চিরকাল ওরাই তো নীলকণ্ঠের মতো নিঃশেষে পান করে নেয়।



শয়তান

হেমেন্দ্র কুমার রায়

পৃথিবীতে আশ্চর্য ঘটনা ঘটে অনেক, কিন্তু সে সব ঘটনায় বিশ্বাস করে এমন লোক অনেক পাওয়া যায় না।

আমার জীবনেও একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল, তা শুধু আশ্চর্য নয় অত্যাশ্চর্যও বটে। তোমাদের কাছে সেই কথাই আজ বলব, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, বিশ্বাস করো! বিশ্বাস না করলেও দুঃখিত হবো না।

সরকারী কাজে আমি তখন হাজারিবাগ অঞ্চলের এক জায়গায় থাকি। একটা মানুষখেকো বাঘের অত্যাচারে সেখানকার লোকেরা পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছিল। বারে বারে দেশী-বিলাতী বহু শিকারীর গুলী হজম করে সে বেঁচে আছে। লোকে বলে, সে বাঘটা নাকি সাধারণ বাঘ নয়—বাঘের আকারে হিংস্র অপদেবতা! কেউ কেউ নাকি চোখের সামনে তাকে হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যেতে দেখেছে! তাকে মানুষের ভাষায় কথা কইতে শুনেছে, এমন লোকেরও অভাব নেই! বনের ভিতরে বসে সে নাকি মেয়েমানুষের মতন আর্তনাদ করত। তার সেই কান্নাকে মানুষের কান্না ভেবে যে বনের ভিতর ঢুকত, সে আর ফিরে আসত না! লোকে তাই তাকে 'শয়তান' বলে

ডাকত! 'শয়তান'কে দেখলেই চেনা যেত, কারণ তার ল্যাজ ছিল না! হয়ত বনের ভিতরে অন্য কোন জন্তুর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েই ল্যাজের গৌরব থেকে সে বঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু লোকের বিশ্বাস, 'শয়তানে'র এই লাঙ্গুলহীনতাই তার অলৌকিকতার মস্ত প্রমাণ। বাঘের ল্যাজ নেই, তাও কখনো সম্ভব?

এ-সব গল্প যে মিথ্যে তাতে আর ভুল নেই। মানুষখেকো বাঘেরা প্রায়ই ভারী চালাক হয়। বড় বড় শিকারীও তাদের বধ করতে পারে না। তাই তাদের নামে এমনি সব গল্প শোনা যায়। বৃক্ষবিশেষের আশ্চর্য শিকড়ের গুণে মানুষ বাঘের রূপ ধরতে পারে, এমন গল্পও শুনেছি। কিন্তু আধুনিক যুগে নিতান্ত মূর্খ ভিন্ন আর কেউ এসব গল্প করবে না।

'শয়তান' যে সাধারণ বাঘ একদিন তার প্রমাণ পেলুম।

বন্ধু হরিশের সঙ্গে একদিন সন্ধ্যার আগে হরিণ মেরে ফিরে আসছি। আমাদের পিছনে পিছনে আসছিল মরা হরিণটাকে কাঁধে করে দুজন কুলি, আর বাঘের মতই বড় আমার সখের কুকুর 'টাইগার'। বনের একটা মোড় ফিরতেই সামনে দেখি, পথের উপরে বিড়ালের মতন কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে, মস্ত বড় একটা বাঘ! তার ল্যাজ নেই!

পিছনের কুলিরা রুদ্ধশ্বাসে, অস্ফুট স্বরে এক সঙ্গে বলে উঠল—'শয়তান!'

পরমুহূর্তেই আমরা দুজনেই এক সঙ্গে বন্দুক ছুঁড়লুম।

'শয়তান' লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেই আবার পড়ে গেল,—আর নড়ল না!

এত সহজে 'শয়তান'কে ঘায়েল করে আমাদের আনন্দের আর সীমা রইল না—কুলি দুজনও মনের খুশীতে ধেই ধেই নাচ শুরু করে দিলে। আশপাশের গাঁয়ে সে খবর তখনি ছড়িয়ে পড়ল—দলে দলে লোক 'শয়তান'কে দেখতে এলো। অনেকে তার মৃতদেহের উপরে কিল-চড় লাথি বৃষ্টি করে মনের ঝাল ঝেড়ে নিলে। অনেক কষ্টে তাদের থামিয়ে

জনকয়েক কুলির সাহায্যে 'শয়তানে'র দেহ তুলে আবার নিজেদের বাসার দিকে রওনা হলুম।

২ ॥

খানিক দূর যেতেই, বিরাট এক ক্রুদ্ধ দৈত্যের মত সারা আকাশ জুড়ে একখানা মিশমিশে কালো মেঘ ছুটে এলো—ভীষণ ঝোড়ো নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে! শহরে বসে তোমরা এই মেঠো বুনো ঝড়ের কল্পনাও করতে পারবে না।

দেখতে দেখতে পরেশনাথ পর্বতের আকাশভেদী চূড়া ধুলো-মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, বনের গাছগুলো পাগলের মতন মাটির উপরে বারবার মাথা কোটবার চেষ্টা করতে লাগল আর যেন কার বিপুল ফুৎকারে সারা-পৃথিবীর আলো কাঁপতে কাঁপতে নিবে গেল! খানিক তফাতেই একখানা পুরানো বাংলো ছিল, আমরা তাড়াতাড়ি তার ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। ঝড়ের পর এলো বৃষ্টি—সন্ধ্যার অন্ধকারকে সঙ্গে করে।

বুঝলুম, আজ আর বাসায় ফেরা হবে না। কারণ এখান থেকে আমার বাসা অন্তত পাঁচ মাইল তফাতে। মাঝে আবার নদী আছে। সেই পাহাড়-নদী বৃষ্টিধারায় পুষ্ট হয়ে এতক্ষণে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে নিশ্চয়!

কুলিরাও চলে যেতে চাইলে—বখশিসের লোভও গ্রাহ্য করলে না। তারা দুটো কারণ দেখালে। প্রথমত, 'শয়তানে'র মৃতদেহের সঙ্গে তারা রাত্রিবাস করতে নারাজ। দ্বিতীয়ত, এই বাংলোয় আগে এক সাহেব থাকত। কারা নাকি তাকে খুন করেছিল। সেই থেকেই এই বাংলোয় কোন মানুষ বাস করতে পারে না। সেই বৃষ্টিতেই কুলিরা বাংলো ছেড়ে পালাল।

শিকারী মানুষ, সব রকম বিপদের জন্যেই সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হয়—সঙ্গে লণ্ঠন এনেছিলুম, তাই জ্বালালুম। ব্যাগের ভিতরে তখনো কয়েক টুকরো পাঁউরুটি আর খানিকটা 'গোয়াভা জেলি' ছিল, তার

দ্বারাই আমার, হরিশের আর 'টাইগারে'র নৈশ-আহার শেষ করতে হবে। উপায় কি? আমরা যে খোলা মাঠে নেই, এখন এইটুকুই পরম সান্ত্বনার কথা।

মাঝের হল-ঘরে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলুম। ঘরখানা প্রকাণ্ড —দেয়ালে দেয়ালে উইদের রাজত্ব, সমস্ত দরজা-জানলাই ভাঙা, মেঝেতে পুরু ধুলোর প্রলেপ—তার উপরে নানা জীবজন্তুর পায়ের দাগ—বাঘের, ভাল্লুকের, শেয়াল-কুকুরের! এখানে-ওখানে হাড় পড়ে আছে—কোন কোন হাড় মানুষের বলেও সন্দেহ হল। বুঝলুম, মানুষের বাড়ি আজ বাঘ-ভাল্লুকের আস্তানায় পরিণত হয়েছে! বললুম, 'হরিশ, এখানে আমরা নিরাপদ নই! বাঘ-ভাল্লুকের সঙ্গে আবার দেখা হতে পারে, বন্দুকে টোটা ভরে তৈরী হয়ে থাকো।'

হরিশ আমার কথামত কাজ করতে করতে বললে, 'আজ রাত্রে দেখছি ঘুমের দফা রফা!'

'শয়তান' আর হরিণের দেহ দুটো ঘরের কোণে টেনে এনে রাখলুম।

॥ ৩ ॥

আকাশের অন্ধকারকে ছ্যাঁদা করে জলধারা অশ্রান্তভাবে গড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর বুকের উপর। বিদ্যুৎ-সাপগুলো কিলবিল করে ক্রমাগত চলে যাচ্ছে শূন্যতার এধার থেকে ওধারে। বৃষ্টি-বাণে আহত অরণ্যের কান্নায় চারিদিক পরিপূর্ণ।

'টাইগার' এই পোড়োবাড়ির ভাঙা ঘর মোটেই পছন্দ করলে না। ঘরময় ছড়ানো হাড়গুলো সে আগে শুঁকে শুঁকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলে। তারপর উপরদিকে মুখ তুলে কিসের ঘ্রাণ নিতে লাগল—যেন সে কোন অদৃশ্য বিভীষিকার সন্ধান পেয়েছে! 'টাইগার' সাহসী কুকুর, বাঘ দেখলেও ডরায় না। কিন্তু সে আজ অত্যন্ত ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল,—পেটের তলায় ল্যাজ ঢুকিয়ে একবার এখানে, একবার ওখানে গিয়ে বসে পড়ে, আবার উঠে কান খাড়া করে যেন

কার পদশব্দ শোনে! আমি তাকে ডাকলুম, সে কিছুতেই কাছে এলো না। থেকে থেকে চমকে ওঠে আর হা হা করে হাঁপায়। হরিশ আশ্চর্য হয়ে বললে, 'টাইগার এমন করছে কেন? সে কি দেখেছে?

আমারও মনে ঐ একই প্রশ্ন!...চারিদিকে তাকিয়েও সন্দেহ-জনক কিছুই দেখতে পেলুম না। বলেছি—মস্ত ঘর। আমার এই ছোট লণ্ঠনের আলোতে সে ঘরের অন্ধকার দূর হয় নি। হঠাৎ মনে হল, দেয়ালের উপর দিয়ে যেন একটা লম্বা ছায়া দুলতে দুলতে সরে যাচ্ছে...হরিশের একখানা হাত চেপে ধরে বললুম, 'দেখ, দেখ!'

টাইগাব ঊর্ধ্বমুখে অস্বাভাবিক, তীক্ষ্ণ, শিয়ালের মত স্বরে কাঁদতে লাগল।

হরিশ বললে, 'কি? কি দেখব?'

—'ঐ ছায়াটা?'

—'কোথায়?'

—'ঐ যে! দেয়ালের উপর দুলছে!'

—'তুমিও পাগল হলে নাকি? ওখানে তো কিছুই নেই!'

চোখ রগড়ে চেয়ে আমিও আর কিছু দেখতে পেলুম না। নিজের ভ্রম বুঝে লজ্জায় চুপ করে রইলুম।

বাইরের বনের ভিতর থেকে একটা বাঘ ক্রমাগত গর্জন করতে লাগল। হয়ত 'শয়তানে'র বউ! বনে বনে স্বামীকে খুঁজে খুঁজে ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছে!...গর্জনটা ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে গেল। হঠাৎ মনে হল আমার কানে কানে কে যেন কথা কইলে! রোমাঞ্চিত দেহে আমি হরিশের কাছ ঘেঁষে সরে বসলুম! আমার মুখের ভাব দেখে হরিশ বললে, 'আবার কি হল?

—'কে আমার কানে কানে কথা কইলে!'

—'সুরেন, তোমার মাথা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে! তুমি যে এমন ভীতু তা জানতুম না!'

তার ধিক্কার শুনে মনটাকে আবার শক্ত আর চাঙ্গা করে তোলবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু কেন জানি না, বুকের ছমছমানি কিছুতেই আজ

থামতে চাইলে না। খালি মনে হয়, আমার চারিপাশ দিয়ে আজ সেই সব পা চলে বেড়াচ্ছে, যে সব পা চললে কোন শব্দ হয় না! আমার চারিপাশে সব অদৃশ্য চোখ! আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তারা আমাদের দেখতে পাচ্ছে! কী অসোয়াস্তি! ওদের চোখ এড়াই কেমন করে? বললুম, 'হরিশ, এ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি চল! এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলেই আমি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাব!'

হরিশ বললে, 'কুলিদের বাজে কথা তোমার মনের ওপরে কাজ করছে! তুমি শান্ত হও। এ রকম পোড়োবাড়িতে এলে অকারণেই গা একটু ছমছম করে বটে, কিন্তু ও কিছু নয়।'

—'কিন্তু টাইগারও অমন কাৎরাচ্ছে কেন? সে তো কুলিদের কথা বোঝে নি!'

—'টাইগার হচ্ছে অবোধ জন্তু, মিছামিছি ভয় পেয়েছে। সে ভয় পেয়েছে বলে তুমিও ভয় পাবে? তুমি যে মানুষ!'

॥ ৪ ॥

এবারে সত্যি সত্যিই ঘরের বাইরেকার দালানে দ্রুত পদশব্দ হল? শব্দটা একটা দরজার কাছে এসে, আবার দূরে চলে গেল। হরিশ বললে, কোন জন্তুর পায়ের শব্দ। আমার মনে হল, কোন জন্তুর পায়ের শব্দ নয়! জীবনে আমার মনের ভিতরে এমন অলৌকিক ভাবের উদয় হয় নি। ভাগ্যে সঙ্গে হরিশ আছে, নইলে আমার অবস্থা কি হ'ত কে তা বলতে পারে? হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলুম, রাত বারোটা। হরিশ খাবারের 'বাস্কেট' বার করে বললে, 'অনেক রাত হয়েছে। এস, এইবারে আমরা খেয়ে নি।'

আমি বললুম 'তুমি একলা খাও। আজ আমার ক্ষিধে নেই।'

ঠিক সেই সময়ে, খুব কাছেই আবার বাঘের ঘন ঘন চীৎকার শুরু হল। 'শয়তানে'র সঙ্গিনী কি খোঁজ পেয়েই এখানে এসে হাজির হয়েছে?

হরিশ বললে, 'বন্দুক নাও! বাঘটা ভেতরে আসতে পারে!'

খুব দীর্ঘ, করুণ ও অস্বাভাবিক এক চীৎকার করে বাঘের ডাক

থামল—সঙ্গে সঙ্গে ভাঙা জানালা দিয়ে ঝটপট করে ঘরের ভিতরে কালো কুচকুচে কি একটা ঢুকে পড়ল! হরিশ বললে, 'বাদুড়!'

তারপরেই দরজার চৌকাঠের উপরে এসে দাঁড়াল, মস্ত বড় একটা কালো কুৎসিত বিড়াল! বাদুড়টা ঘরের চারিদিকে চক্রাকারে উড়তে লাগল আর কালো বিড়ালটা ল্যাজ তুলে ডাকতে লাগল, ম্যাও! ম্যাও! ম্যাও! ম্যাও! ম্যাও!

বাদুড়টা হঠাৎ গোঁত্তা খেয়ে 'শয়তানে'র মৃতদেহের উপরে গিয়ে পড়ল, তারপর দুই ডানা বিস্তার করে সেখানেই স্থির হয়ে রইল—একটা মূর্তিমান অভিশাপের মত!

টাইগার আবার দাঁড়িয়ে উঠল এবং ভয়ানক এক আর্তনাদ করে আমার পায়ের কাছে এসে পড়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে তার গায়ে হাত দিয়ে দেখি, সে মরে গেছে!

হরিশ সবিস্ময়ে বললে, 'সুরেন! দেখ, দেখ!'

ওঃ! কি সে দৃশ্য! যাকে আমরা স্বহস্তে গুলী করে মেরেছি,—যার মৃতদেহ এতগুলো কুলি কাঁধে করে এনেছে,—যে মরে এতক্ষণে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, সেই 'শয়তান' এখন আমাদের চোখের সামনেই চার পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—আর, তার দুটো চক্ষু আগুনের দুটো গোলার মতন দাউ-দাউ করে জ্বলছে আর জ্বলছে! সে চোখটা যেন আমাদের ভস্মসাৎ করে দিতে চায়! বাইরে আবার বাঘ ডাকতে লাগল। 'শয়তান' ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। সেই বাদুড় আর কালো বিড়ালকেও আর দেখতে পেলুম না!

চীৎকার করে আমি মাটির উপরে পড়ে গেলুম।

॥ ৫ ॥

সেই সপ্তাহেই দরখাস্ত করে অন্য দেশে বদলি হয়েছি—পাছে নে'র সঙ্গে আবার দেখা হয়!

হরিশের মতে, আমাদের বন্দুকের গুলীতে 'শয়তান' মরে নি, হয়ে পড়েছিল মাত্র। হতেও পারে। না হতেও পারে।



রাজার গল্প

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

চৈত্র সংক্রান্তির দিন রাজা তাঁর মুকুট এবং সিংহাসন ত্যাগ করবেন। সেদিন প্রজাবর্গের সামনেই তিনি তাঁর পিতৃপুরুষের বৃত্তি গ্রহণ করবেন হলকর্ষণ করে। তাঁর রাজকীয় মহিমার অবসান হবে। রাজাহীন রাজ্যে তিনি প্রজাসাধারণের সঙ্গে সমভূমিতে নেমে আসবেন। সেদিন সেনাপতি, নগরকোটাল এবং পৌরপ্রধানেরাও নিয়োজিত হবেন তাঁদের পুরাতন বৃত্তিতে। পৈতৃক কামারশালায় ফিরে যাবেন সেনাপতি, নগরকোটাল যাবেন তাঁর বিপনীতে, চিকিৎসাবিদ্যায় ফিরে যাবেন পৌর-প্রধান। কারাগার বহুকাল বন্দীশূন্য, কারাধ্যক্ষ প্রত্যাবর্তন করবেন বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্রে। সমাজ রাষ্ট্রশূন্য হবে। শাসনযন্ত্রের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

সংক্রান্তির আগের রাত্রিতে রাজা তাঁর মন্ত্রণাকক্ষে ডেকে পাঠালেন সেনাপতিকে। সহাস্যমুখে প্রশ্ন করলেন—সেনাপতি, আপনার প্রয়োজন কি এ রাজ্যের পক্ষে সত্যিই ফুরিয়েছে?

সেনাপতি অনায়াসে উত্তর দিলেন—মহারাজ, এ রাজ্যের আর সেনাপতির প্রয়োজন নেই। আমরা আর রাজ্যজয় ছেড়ে দিয়েছি...

রাজ্যরক্ষারও কোনো প্রয়োজন নেই। প্রতিবেশী রাষ্ট্ররা একে একে সকলেই আমাদের আদর্শ গ্রহণ করেছেন। আদর্শের দ্বারাই আমরা প্রকৃত রাজ্যজয় করেছি। তাঁরা মিত্র-ভাবাপন্ন হয়েছেন, সমাজতন্ত্রের মূল্য উপলব্ধি করেছেন। শীঘ্রই মানুষের মন থেকে নিজরাজ্য এবং পররাজ্যের ভেদবুদ্ধি লুপ্ত হবে। ফলে আক্রমণের কোনোই আশঙ্কা নেই। হ্যাঁ মহারাজ, আমার সেনাপতিত্বের প্রয়োজন এ রাজ্যের পক্ষে ফুরিয়েছে। আমি খুব আনন্দিত মনে কামারশালায় ফিরে যাবো। সেই কামারশালায় আমি ছেলেবয়সে হাপর ঠেলতাম, আমার বাবা লোহা গলাতেন। সেই স্মৃতি আমাকে এখনো সুখবোধে আচ্ছন্ন করে। আমি এখন সেই কামারশালাকে উন্নত করেছি। নূতন যন্ত্রলাঙ্গলের নানা অংশ সেখানে তৈরী হবে—সেইভাবেই আমি নূতন করে কাজে লাগব।

তাঁকে বিদায় দিয়ে রাজা ডাকলেন নগরকোটালকে। রাজার প্রশ্নের উত্তরে কোটাল নির্দ্বিধায় বললেন, মহারাজ, বহুকাল হয় আমি কোটালত্ব ভুলে গেছি। রাজ্য সুসাশিত হয় তখনই যখন প্রতিটি মানুষ তার নিজের বিবেক দ্বারা শাসিত হয়। এখন এ রাজ্যে একজন সালঙ্কারা সুন্দরী অষ্টাদশী কন্যা একাকিনী দিনে ও রাত্রে সর্বত্র ভ্রমণ করতে পারেন, তাঁর আভরণ ও সতীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে। গৃহস্থরা দ্বার উন্মোচিত রেখে, শয়ন করতে পারেন, ঘরে কেউ প্রবেশ করবে না। মহারাজ আমাকে আর এ রাজ্যের প্রয়োজন নেই। আমার ঠাকুর্দার মুদিখানায় আমি ফিরে যাবো। যদিও সে দোকান এখন রাষ্ট্রায়ত্ত। সব দোকানই তাই। তবে সেখানে আমার ছেলেবেলার স্মৃতি আছে। সেই দোকানটিকে এখনো আমি ভালবাসি।

এরপর পৌরপ্রধান। প্রশ্নের উত্তরে বললেন—মানুষের বোধ জেগেছে। এ নগরকে পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব সব নাগরিকই বহন করেছেন। আমার আর প্রয়োজন কি? প্রধানের তখনই যখন অধঃস্তনেরা নাবালকের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন

হয়। চিকিৎসক হিসাবে এক সময়ে আমি দেখেছি যে রুগী আরোগ্যলাভ করলে তাকে চিকিৎসামুক্ত করতে হয়। এখন পৌরকার্যও চিকিৎসামুক্ত হোক। নাগরিকরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সংক্রামক ব্যাধি কিছু নেই, নদীর জল জীবাণুমুক্ত, মানুষের জন্মহার নিয়ন্ত্রিত, বৃদ্ধ ছাড়া আর কোনো বয়সেই কোনো মৃত্যুহার পরিলক্ষিত হয় না। মহারাজ, আমার পুরোনো বৃত্তি যদিও আর খুব একটা কাজে লাগবে না, তবু সেই বৃত্তিতেই আমাকে ফিরে যেতে দিন!

এলেন কারাধ্যক্ষ। বললেন—প্রজারা আর নিয়ম ভাঙে না। বড় অপরাধ দূরের কথা, তারা পরস্পরকে কথাচ্ছলে অপমানও করে না আর। প্রত্যেকেই বিনয়ী এবং ভদ্র, কর্তব্যে সজাগ। ফলে প্রধান এবং তাঁর সহকারী বিচারকেরা কেবল আইনতত্ত্ব গবেষণা করে সময় কাটান, প্রয়োগের সুযোগ ঘটে না। মানুষ নিজের মহামূল্যবান জীবনকে উপলব্ধি করেছে, ফলে নরহত্যা ঘটে না। মানুষ তার প্রয়োজনীয় সব কিছুই অনায়াসে পাচ্ছে, ফলে চৌর্যবৃত্তি বন্ধ। পূর্ব অভিজ্ঞতা বলে প্রতিটি মানুষই জানে যে তার কর্তব্যে অবহেলা অন্যের সাতিশয় অসুবিধার কারণ ঘটাতে পারে, ফলে বিনা উৎকোচে সমস্ত কার্য যথাসময়ে সিদ্ধ হয়। সেজন্য কারাগার জনশূন্য। এত জনশূন্য যে প্রহরীরা সে দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে বিষণ্ণ থাকে। মহারাজ, আপনি আমাকে বিদায় দিন, কারাভবনকে অন্য কোনো ভবনে রূপান্তরিত করুন, প্রহরীদেরও ভিন্ন বৃত্তিতে নিয়োগ করুন।

এইভাবে একে একে সব রাজকর্মচারীকেই জিজ্ঞাসা করলেন রাজা। বুঝতে পারলেন, বাস্তবিকই রাষ্ট্রের প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

তবু নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য তিনি এবার একে একে কিছু কিছু প্রজাকে ডেকে পাঠাতে লাগলেন।

প্রথমেই এলেন রাজ্যের সবচেয়ে বৃদ্ধ মানুষটি, যার বয়স একশ বাট বৎসর, যিনি এখনো সরলকাণ্ডবিশিষ্ট গাছের মতো দাঁড়ান, যিনি নিয়োজিত আছেন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্রে, বিশ্রাম জানেন না।

রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী নামমাত্র অভিবাদন করলেন রাজাকে, সমান আসনে বসলেন। রাজা তাঁকে অভ্যর্থনা করে বিনীত মুখে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি সবচেয়ে প্রাচীন মানুষ। এ রাজ্যের পূর্ব অবস্থাও জানেন। এখনও বলুন এ রাজ্যে রাজা বা রাষ্ট্রীয় শাসনের প্রয়োজন আছে কিনা।

বৃদ্ধ ক্ষণেক চিন্তা করে বললেন—মহারাজ, আপনি নিজে এ রাজ্যের সাধারণ প্রজা ছিলেন। আপনার পিতা ছিলেন আমার প্রতিবেশী। এ রাজ্যের অরাজক অবস্থায় আপনি রাজদণ্ডের ভয় না রেখে দুর্বল-ভীরু-পীড়িত জনসাধারণকে জোটবদ্ধ করে বিপুল এক মনুষ্যশক্তির জন্ম দিয়েছিলেন। শক্তি মাত্রই নিরপেক্ষ—শুভ বা অশুভ যে-কোন কাজেই তাকে লাগানো যায়। আপনি সেই শক্তিকে মঙ্গলামুখী করেছিলেন। ফলে আমরা এক অদ্ভুত রাষ্ট্রের জন্ম হতে দেখেছি। এ রাজ্যে যখন প্রথম খাদ্য ও শস্য বিনামূল্য হয়ে গেল তখন এটাকে সত্য বলে মনে হয়নি। সেদিন আমি নগরের বিভিন্ন আহার গৃহে গিয়ে আহার করেছি। যদৃচ্ছা যা প্রাণে চায় তাই খেয়েছি, এবং বেরোনোর সময়ে কেউ দাম চাইছে না দেখে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করেছি, নিজেকে চোরের মতন মনে হয়েছে। আমার মতো বহু মানুষই সেদিন ঐরকম করেছে, তারা দেখেছে সতিই সব বিনামূল্য, তবু তাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। এই বিনামূল্যে খাদ্য পাওয়ার ব্যাপারটা বেশী দিন স্থায়ী হবে না ভেবে কয়েক-দিন আমি খুব খেয়েছিলাম। ফলে আমার পেট খারাপ হয়। আমার নাতি আমার এই কাণ্ড দেখে খুব হেসেছিল। তারপর মহারাজ, এক সময়ে এই রাজ্যে পরিধেয় বস্ত্র, তৈজস, আসবাব সবকিছুই মূল্যহীন হয়ে গেল। আমি বিস্তর দোকানে ঘুরে হাজার জিনিস নিয়ে এসে বাসা ভর্তি করলাম। কিন্তু কেউ সেগুলো কেড়ে নিতে এল না। জিনিসগুলো আমারই রয়ে গেল। ক্রমে বুঝতে পারলাম আমি খামোখা এত জিনিস সংগ্রহ করেছি। আমরা আগে দুর্দিনের জন্য সুদিনের সঞ্চয় রাখতাম। কিন্তু এখন দুর্দিন নিঃশেষিত হয়েছে, ফলে এই সঞ্চয় ঘরকে অরণ্যে পর্যবসিত করেছে। আমি তাই সব জিনিস ফিরিয়ে

দিয়ে এলাম। তারপর আগের মতোই অপ্রচুর জিনিসের ঘরগৃহস্থালীতে সুখী বোধ করতে লাগলাম আবার আগের মতো। আমি মিতাহারী। মহারাজ, যখন সেদিন আমার কানে এল যে আপনি সিংহাসন ত্যাগ করে সাধারণ জীবন গ্রহণ করবেন সেদিনও আমার মনে শঙ্কা জেগেছিল যে, রাজা না থাকলে আবার অরাজকতা দেখা দেবে হয়তো, আবার পাপ আসবে। কিন্তু মহারাজ, একটু ভেবে দেখলাম, ঠিক যেভাবে আপনি আপনার পূর্ব-সিদ্ধান্তগুলোতে সাফল্যলাভ করেছেন, ঠিক সেভাবে এতেও আপনি সফল হবেন। না মহারাজ, সম্ভবতঃ এ রাজ্যে আর রাজার প্রয়োজন নেই।

আর একজন প্রজা এসে পূর্ববৎ অভিবাদন করে আসন গ্রহণ করলেন এবং বললেন—মহারাজ, আপনার শাসনবিধির তুলনা নেই। খাদ্য, পানীয়, বসতগৃহ, চিকিৎসা, যানবাহন ইত্যাদির জন্য আমাদের কোন ব্যয় নেই। এ রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত আমি যে কোনো খানে ভ্রমণ করতে পারি, যে কোনো আহারগৃহে আহার করতে পারি, যে কোনো চিকিৎসককে ডেকে চিকিৎসা করাতে পারি। তার জন্য আমাকে কিছুই ব্যয় করতে হবে না। মহারাজ, আমার পিতামহের দানশীলতার খ্যাতি ছিল কিন্তু তিনি যদি আপনার রাজ্যে বাস করার অভিজ্ঞতা লাভ করতেন তবে অবশ্যই খ্যাতিলোপের ভয়ে রাজ্য ছেড়ে পালাতেন। কারণ, তাঁর দানগ্রহণ করার মতো একজনও দুঃখী বা অভাবী লোক এখানে নেই। মহারাজ, আমরা এখন আর মানুষের দয়াধর্মকে মহৎ গুণ বলে অভিহিত করি না, কারণ দয়াগ্রহণ মনুষ্যত্বের অবমাননাস্বরূপ। মহারাজ, আমরা আমাদের যৌথ দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সজাগ। কাজেই রাজকীয় শাসনও দয়াধর্মের মতোই অপ্রচলিত হয়ে গেছে।

পরবর্তী প্রজা এক মধ্যবয়স্ক চিত্রকর। তিনি বললেন—মহারাজ, আমার পিতা ছিলেন যোদ্ধা। তিনি এক সময়ে এ রাজ্যের হয়ে বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছেন। তিনি মহাবীর খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর গায়ে নানা অস্ত্রাঘাতের চিহ্নও ছিল। জীবনের

শেষদিন পর্যন্ত ঐ চিহ্নগুলোকে তিনি পদকের মতো ভালবাসতেন। এই যুদ্ধপ্রিয় লোকটি নরহত্যার অপ্রয়োজনীয়তাকে কখনো বুঝতে চাইতেন না। যুদ্ধ না থাকলে মানুষ হীন ও নিবীর্য হয়ে যাবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল। ছেলেবেলায় তাই আমি যুদ্ধবাজ মনোভাবাপন্ন ছিলাম। আমি প্রথম ফড়িং-পাখী, তারপর কুকুর-বেড়াল-বাঁদর এইসব হত্যা করতে শুরু করি। বাবার মতো হওয়ার জন্য শীঘ্রই আমি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী বালককে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত্যা করব এরকম অভিলাষও আমার ছিল। ঠিক সেই সময়েই আমি আপনার বিপ্লবে অংশীদার হই যুদ্ধের আশায়। এবং কালক্রমে আপনার আদর্শকে বুঝতে পারি, এবং আমার হৃদয় শান্ত হয়, যুদ্ধস্পৃহা জ্বরের মতো সেরে যায়। নিরীহ পশুপাখী হত্যা করে যে পাপ আমি করেছিলাম এখন তার স্খালন করি এই হাতে তাদেরই ছবি এঁকে। মহারাজ, এক সমাজব্যবস্থায় হয়তো যুদ্ধের এবং বীরত্বের প্রয়োজন ছিল, এখন তা ফুরিয়েছে মহারাজ, হয়তো সেরকম রাষ্ট্রযন্ত্রেরও প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা এতটাই আত্মবিশ্বাসী যে ঈশ্বরও আমাদের কাছে কিংবদন্তী মাত্র!

সংক্রান্তির দিন সকালে রাজা স্নান করলেন। পুরোহিতকে বললেন—কেউ যখন রাজা হয় তখন তার অভিষেকের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু রাজা যদি যে-কেউ একজন হতে চায় তখন কি তার কোনো অভিষেক আছে?

পুরোহিত মাথা নাড়লেন—না, মহারাজ।

প্রাকারের পাশে সুসজ্জিত বেদীতে সাজানো সিংহাসন। রাজা সেখানে এসে বসলেন। হাতে তুলে নিলেন রাজদণ্ড, মাথায় পরলেন মুকুট। শেষবারের মতো। সামনের আম্রকাননে হাজার হাজার কৌতূহলী প্রজা সমবেত। এক পাশে শূন্য একটু জমিতে চাষীর পোশাক এবং বলদযুক্ত একখানা হল রয়েছে। রাজা আজ আনুষ্ঠানিক-ভাবে সিংহাসন, মুকুট ও দণ্ড ত্যাগ করে হলকর্ষণ করবেন। রাজাকে আজ বেশ আনন্দিত ও তৃপ্ত দেখাচ্ছিল।

রাজা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

তিনি গম্ভীর গলায় গতকাল রাত্রে যাদের সঙ্গে কথা হয়েছিল তাদের সাক্ষ্যপ্রমাণ উল্লেখ করে বললেন যে, তাঁর শাসনের প্রয়োজন সত্যিই ফুরিয়েছে। এবার সমাজ হবে রাষ্ট্রহীন। মনুষ্যত্বই হবে প্রকৃত শাসক।

রাজা মুকুট খুললেন, রাজ-পোশাক উন্মোচন করলেন, সিংহাসন ত্যাগ করে সিঁড়ি দিয়ে ধীর পদক্ষেপে নামতে লাগলেন।

নিস্তব্ধতার মধ্যে হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠল— মহারাজ, কাল রাত্রিতে আমার ঘরে চোর ঢুকেছিল···

সবাই চকিত হয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল। সেনাপতি কোমর কোমরবন্ধ তলোয়ারসুদ্ধ খুলে রাখতে যাচ্ছিলেন। এই কথা শুনে কোমরবন্ধ আবার আঁটলেন। কারাধ্যক্ষ চকিত হয়ে হাতে ধরা ইস্তফা-পত্রটি লুকিয়ে ফেললেন।

আর একটি কণ্ঠ চেঁচিয়ে বলল—মহারাজ, আজকের অনুষ্ঠানে সম্মুখবর্তী এই আসনটি পাওয়ার জন্য আমাকে বিশ মুদ্রা উৎকোচ দিতে হয়েছে···

আর একটি কণ্ঠও আর্তনাদ করল—মহারাজ, কিন্তু তার অভিযোগ গোলমালে পাল্টা চীৎকারে শোনা গেল না। কিন্তু বহু কণ্ঠের আর্তনাদ উঠতে লাগল মহারাজ, মহারাজ, মহারাজ···

মাঝসিঁড়িতে থেমে দাঁড়ালেন রাজা। বিস্মিত, ব্যথিত। ভ্রূকুটি করলেন। তারপর হতাশ ক্লান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সামনের উদ্বেলিত জনসাধারণের দিকে।

তারপর ধীর ক্লান্ত পায়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে লাগলেন পরিত্যক্ত সিংহাসনের দিকে।

একটি অমানুষিক বই



কবিতা সিংহ

অকালে বর্ষা হলে এখনো আমার বড় আতঙ্ক হয়। বিশেষ করে ঘোর পৌষমাসে যদি অকাল বর্ষা হয়। কি আপিসে, কি পার্কে, কি বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি, যেখানেই থাকি না কেন, যেই দেখি আকাশে চাপ চাপ ছাই রঙা মেঘের দল ধীরে ধীরে জড়ো হয়ে রাগী বেড়ালের মত গরগর করছে আর নীল বেগুনি ঝিলিক্ দিচ্ছে, আমি সো—জা বাড়িমুখো হই। আমার সরু গলির ছোট নিরাপদ বাড়ির কোণের ঘরটুকুই তখন হয় আমার একমাত্র আশ্রয়। হাত-পা ধুয়ে সোজা ঘরে চলে আসি। লাল শেড্ দেওয়া আলোটা জ্বেলে দিয়ে সিধে ঢুকে পড়ি নরম বিছানার গরম লেপের তলায়। ইচ্ছে হলে রেডিও খুলে দিই, না হলে চোখ বন্ধ করে চিন্তা করি। চিন্তার বিষয় অনেক। তবে অকাল বর্ষণ, ঘরের ওই ঘুম ঘুম আলস্যে আরামদায়ক সব চিন্তাই নরম নরম পুষির মত গা ঘেঁষটে আসে।

কিন্তু মাফ করবেন, আমি কখনও বই পড়ি না। না, বই পড়তে যে আমি ভালোবাসি না তা নয়। লেপের মধ্যে থেকে ঠাণ্ডায় হাত বের করতে হবে বলেও না। বই পড়ি না অন্য কারণে।

অকাল বর্ষণে কেন বাইরে যাই না, বাইরে গেলেও কলেজ স্ট্রীটে কদাপি যাই না, অকাল বর্ষণে কেন বই পড়ি না, বই পড়লেও কদাপি ভূতের বই পড়ি না, সেই কথাই আজ বলতে যাচ্ছি আপনাদের। বছর তিনেক আগে একটি অমানুষিক ঘটনা ঘটেছিল আমার জীবনে।

সে সময়ে আমি ঘরে থাকলেও কলকাতায় বৃষ্টি হলে বাইরে বেরিয়ে পড়তাম।

একবার এমনি লক্ষ্যহীন হয়ে ঘুরতে ঘুরতে কলেজ স্ট্রীটের ট্রামে উঠে পড়লাম। ট্রাম খানিক দূর যাবার চেষ্টা করবার পর কলকাতা অাঁধার। কারেন্ট্ ফেল্ করেছে বলে একটা রব উঠল। হাড় কাঁপানো শীতে কাঁপতে কাঁপতে অন্ধকারে কলকাতার চক্‌চকে, সপ্‌সপে কালো পিঠে নেমে পড়লাম। কাদামেশানো ঠাণ্ডা জল আমার জুতোর মধ্যে ঢুকে পড়ে দারুণ অসুবিধে হচ্ছিল। অন্ধকারের মধ্যে, সার সার বিরক্ত মানুষের সংগে আমিও হাঁটছিলাম। রাস্তা আরো বেশি অন্ধকার। কারণ রাত আটটার পর সব দোকান পাট বন্ধ হয়ে যায়। আমি অবশ্য কলেজ স্ট্রীটের স্তব্ধ মরা বিশাল অট্টালিকার গায়ে গজানো দোকান-পাটগুলোর গ্যাসের নীল্‌চে শিখা ধরে ধরে এগোচ্ছিলাম।

জামাকাপড়ের দোকান ছাড়িয়ে পুরোনো বই-এর দোকানের সারি। এই সব দোকানই আমার বড় প্রিয় আশ্রয়। ত্রিপলের তলায় একা দাঁড়িয়ে বৃষ্টির চড়্‌চড় শব্দ শুনছি আর বই ঘাঁটছি। মাসের প্রথম তখন। বই কেনার বাধাও নেই। সত্যি কথা বলতে কি পুরোনো বই-ই আমার প্রিয়তম বই। উপহারের জন্য নতুন বই দিতে হয়, নইলে অপরে নানারকম মনে করেন। যদি না মনে করতেন তাহলে আমি হয়ত বন্ধুবান্ধবকে পুরোনো বই-ই কিনে দিতাম। বিশ্বাস করুন পরের জন্য নতুন বই কিনলেও নিজের কিন্তু কখনই পুরোনো বই ছাড়া কিনি না। বই ঘাটতে ঘাঁটতে এক চেনা ষ্টলে এসে দাঁড়ালাম। বুড়ো দোকানদার সেই ছাত্রাবস্থা থেকে আমায় চেনে। চাদরের মধ্যে হাত

ঢুকিয়ে গুটিসুটি মেরে বসেছিল বুড়ো। আমায় দেখে হাসলে। সর্দি ঘড়ঘড়ে গলা দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ বেরুল।

আমিও একটু হাসি ফিরিয়ে দিয়ে বই বাছতে লাগলাম। প্রথমে যে বইটা আমার চোখে লাগল সে বইটা প্রায় ডিক্সনারির মত মোটা। কালো চামড়ায় বাঁধানো। অনেকগুলো চটি চটি বই-এর মধ্য থেকে বইটা একটু উঁচু হয়ে বেরিয়েছিল।

আমি বইটা টেনে বের করলাম। ইংরেজী ভাষায় রচিত বাছাই করা ভূতের গল্প। আমি ভূতের গল্প পড়তে ভালোবাসতাম। বইটি টেনে নিয়ে চোরা চাউনি চালান করলাম।

বুড়ো বই পত্তর ঠিক চেনে। কোন বই-এর ঠিক কত কদর তা তার জানা। মিটিমিটি চেয়ে একটু হাসল।

আমি বললাম, কতয় দেবে ?

ঘড়ঘড়ে গলায় বুড়ো কি যেন বলল।

আমি যেন শুনলাম, দশটাকা।

রাগ হল। আজকাল বুড়ো ষ্টলে বসত না। ওর ছেলেরা দেখাশুনো করত ষ্টলটা। বাপের মত গুণ ছিল না ছেলেগুলোর। আমি নিজেই বহু বই সস্তায় কিনেছি এই ষ্টল থেকে। এখন এই লোভনীয় বইটি ছাড়ি কি করে!

কিন্তু কেন যেন বুড়োর চতুর চতুর মুখখানা দেখে রাগ হল। এ ষ্টলে গ্যাসও জ্বলছে না। কাঁপা কাঁপা মোমের আলোয় বলিরেখা টানা মর্কটের মত মুখ বুড়ো'র। আর ঘষা মার্বেলের মত চোখ আমার অদ্ভুত লাগছিল।

আমি স্টল ফেলে রওনা হলাম আর একটা স্টলে। কি আশ্চর্য দ্বিতীয় ষ্টলটাতেও ঠিক তেমনি কালো চামড়ায় বাঁধানো ডিক্সনারি সদৃশ বই। ইংরাজি ভাষায় লেখা ভূতের গল্পের সঙ্কলন।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। তাহলে দ্বিতীয় একটি বইও আছে। স্টল-ওয়ালা নবীন যুবক। বিড়ি ফুঁকছিল।

আঙুল দিয়ে দেখালাম। কত ?

ভালো করে না তাকিয়েই ছেলেটি বলল, পনর।

আমি তবু বইটা উল্‌টে পাল্‌টে ঘাঁটতে লাগলাম। তৃতীয় গল্প 'অন্ধকার কোণ' আরম্ভে শুক্‌নো পানের পিচের মত হাল্কা ছাপ; চতুর্থ গল্প 'সবুজ চার' ওর পাশে পেনসিলে মার্কা দেয়া চারশ আটানব্বই পাতার একটা নাম লেখা। তবে কি ভাষায় লেখা তা ঠিক বুঝলাম না।

আস্তে বইটা যথাস্থানে রেখে এগুলাম।

আবার তৃতীয় স্টল।

কি আশ্চর্য আবার আর একটা বই। ঠিক অমনি। কালো চামড়া বাঁধাই। ওই ইংরেজি ভাষায় লেখা, বাছাই করা ভূতের গল্প।

মনে মনে হাসলাম। বুড়ো আমায় ঠকাতে চেয়েছে। অথচ সব দোকানেই একটা করে কপি মজুত।

কি করে হয়।

কোনো পুরোনো প্রকাশনীতে হয়ত গোটাকতক কপি জমা হয়েছিল। কেউ বাঁধিয়ে একসঙ্গে লটে পুরোনো বই-এর দোকানে ছেড়েছে। না হলে এমন একই রকম বাঁধাই হয় কি করে?

আমি এটা সেটা দেখতে দেখতে বইটা টেনে নিলাম।

দোকানি আগাপাস্তালা মুড়ি দিয়ে প্রায় ঘুমোচ্ছে। সেই একটা বই এরই কপি, ইংরেজী ভাষায় লেখা ভূতের গল্পের সঙ্কলন।

আমি পুলকিত হয়ে বইটি তুলে নিলাম। পাতা উল্টে দেখলাম, আরে ঠিক আগের স্টলে দেখে আসা বইটার মতই, অবিকল, এ বইটিতেও তৃতীয় গল্প 'অন্ধকার কোণ'-এর আরম্ভে শুক্‌নো পানের পিচের মত হাল্কা ছাপ, চতুর্থ গল্প 'সবুজ চার'-এর পাশে পেনসিলের মার্কা দেওয়া, চারশ আটানব্বই পাতায় সেই একটি নাম ঐ একই ভাবে লেখা। তবে ভাষাটি বুঝলাম না।

আমার শরীরের ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল।

আমার হাতের মধ্যে বইটা থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল। বইটা তাড়াতাড়ি যথাস্থানে রেখে দিয়ে চলে যাব, হঠাৎ যেন বইটা আমার হাত থেকে লাফিয়ে পড়ে আমার পায়ে একটা ঠোকর মেরে ফুটপাথের কাদায়

জলে পড়ে গেল। অভ্ত যে শব্দ হল দোকানদার একবার চোখ তুলেও দেখল না। আমি আস্তে বইটি তুললাম। 'কঙ্কাল' গল্পটি একেবারে কাদায় গুলে মাখামাখি হয়ে গেছে। চোরের মত বইটা তুলে যথাস্থানে রেখে কোনো মতে পালিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় বুড়োর স্টল থেকে হাত-ছানি দিয়ে ডাকল বুড়ো।

হাওয়ায় ফ্যাসফ্যাসে হয়ে ভেসে উঠল বুড়োর কণ্ঠ।

যান নিয়ে যান বইটা।

কতয় দেবে বলো? উৎসাহিত বোধ করলাম আমি।

বুড়ো বলল, কতয় আর? যা দেন!

বুড়োর মুখের দিকে তাকালাম আমি।

মোমবাতির নিভু নিভু আলোয় বুড়োর মুখখানা আশ্চর্য ম্লান লাগছিল। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম বাঁশ পাতার মত থর থর করে কাঁপছে বুড়ো। চারপাশে থই থই কাদাগোলা জল। ভারি করুণ লাগল আমার। বুড়ো মানুষ কোথায় এই শীতে এই অকাল বর্ষায় ঘরের মধ্যে গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকবে, তা নয়, এই শেষ বয়সে কত কষ্ট করতে হচ্ছে বেচারীকে। বুড়োর ছেলেগুলোকে অন্য সময়ে দেখি। এই বর্ষার রাতে বুড়ো বাবাকে ঠেলে দিয়ে তারা যে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল?

আমি আর দরদাম করলাম না। ব্যাগ্ হাতড়ে দশটাকার নোট একখানা বের করে বুড়ার সামনে কাঠের পাটায় একখানা বই চাপা দিয়ে রেখে দিলাম। বললাম, থাক ভাই, আর বেঁধে দিতে হবে না। আমি এমনিই নিয়ে যাচ্ছি।

বুড়ো আমার দিকে চেয়ে কৃতজ্ঞতার হাসি হাসল। বুড়ো বুঝতে পেরেছিল যে সে চুপ করে বসে তার জীর্ণ কাপড়ের ভিতর যে সামান্য একটু উষ্ণতা সঞ্চয় করেছে আমি নড়াচড়ার ফলে তার সেই ওমটুকুও যে নষ্ট হয়ে যায় তা চাই না।

বইটা নিয়ে আমি যেই স্টলের দিকে পিছন ফিরলাম অমনি দপ্

করে সারা কলকাতা জ্বলে উঠল। রাস্তার আলো, ট্রামের আলো, সব।

আমি খানিক দূর গিয়ে আবার যখন ফিরে তাকালাম, তখন স্টলের সেই বুড়োকে আর ঠাহর করতে পারলাম না। তার মোমবাতি জ্বালা ছোট্ট স্টলটি আলো জ্বলে ওঠা কলকাতার উজ্জ্বলতায় হারিয়ে গেল। আমিও দৌড়ে চলন্ত ট্রামে উঠে পড়লাম। বাব্বা এখন আর কোনো কথা নয়, সোজা বাড়ি। প্রায় ফাঁকা ট্রাম। একটি কি দুটি যাত্রী। তখনও আকাশ কি আশ্চর্য সেই একই রকম নাকে কান্না কেঁদে চলেছে। এতক্ষণ ধরে সমানে ঘ্যান্‌ঘ্যানে বৃষ্টি হয়ে যাবার পর ঝামেলা বেড়েছে ঐ উত্তুরে হাওয়া নিয়ে।

ট্রামের ঝিমোনো আলোয় কোলের ওপর রাখা বইখানাকে যেন দারুণ এক সম্পদ মনে হচ্ছিল আমার। বাড়ি ফিরে অমন একটি লোভনীয় বই কোলের কাছে নিয়ে লেপের আড়ালে আরামে ডুব দেওয়া। সত্যি ভাবতেও আরাম লাগছিল আমার।

বাইরে বৃষ্টির ধারা আরও বাড়ল।

বেশ ভালো লাগছিল। শীতের শিরশিরোনি, গায়ে বৃষ্টির দুটো একটা বিন্দু। হাওয়ার ছুরিকাঘাত, আর ঝিমোনো কলকাতার অদ্ভুত চেহারা।

কিন্তু বৃষ্টির জোর বাড়াতে বাধ্য হয়ে জানালা টেনে দিলাম। শার্সি এঁটে দিলাম। এতক্ষণ কি করা যায়? অতএব কোলের কাছে বইটিই ওলটানো যাক। সদ্য কেনা বইটা খুলে ধরলাম। খুলে গেল ঠিক তৃতীয় গল্পটা. সেই, 'অন্ধকার কোণ'! কি আশ্চর্য! 'অন্ধকার কোণে'র মাথায় সেই আশ্চর্য দাগ। পানের পিচের মত। রক্তের ছোপের মত। অস্পষ্ট। খয়েরী। আর কি আশ্চর্য 'সবুজ চার'-এর আগে সেই পেনসিল মার্কা! এবং···আমার দুহাত থর থর করে কাঁপতে লাগল। কি নিদারুণ ব্যাপার 'কঙ্কাল' গল্পটার প্রথম পাতাটা কি করে এমন জলে কাদায় মাখামাখি! আমি ত বুড়োর স্টলের বইটা জলে কাদায় ফেলিনি! ফেলেছিলাম তৃতীয় স্টলের বইটা।

আমার প্রথমে দুহাত, তারপর সারা শরীর ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল। আমি, আমি কি ভূত দেখছি?

না।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। ভূত নয়, মাত্রই একটি ভূত বিষয়ক বই দেখছি।

কলেজ স্ট্রীটের পুরোনো বই-এর সেই স্টল থেকে সেবার আমার বই কেনার সংগে কলকাতার সেই অকাল বর্ষণের কোনো যোগসাজস ছিল কিনা জানিনা তবে সেই ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি চলেছিল, তিনদিন, আর আমার ঘোর জ্বরবিকার চলেছিল সাতদিন ধরে। সাতদিন ধরে লেপের তলায় মুড়ি দিয়ে দিয়ে থর থর করে কেঁপেছি আর আমার চোখের সামনে আলোর ফুলঝুরি কেটেছে।

আমার ধারণা সেই সন্ধ্যায় অত বেশি ঠাণ্ডা লাগানোর ফলেই আমার অত ঘোর জ্বর হয়েছিল। আর সেই জ্বরেই অত ভুল দেখেছি। আর ভুল ভেবেছি। জ্বর খানিকটা নামবার পরও ডাক্তারবাবু আমাকে শয্যা ত্যাগ করতে বারণ করলেন। আমি ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট, কাজু বাদাম, মাঝে মাঝে গরম দুধ এবং ভূতের বইটি সম্বল করে আবার বিছানা সই হলাম। বইটার আরম্ভে কোনো সুচীপত্র নেই। পাতাগুলো লাল্‌চে। একটু চাপ দিলেই ভেঙে আসবে মনে হয়। গল্পগুলোর আরম্ভে শুধু নাম। আর লেখকেব নাম। মাখন মাখানো বিস্কুট খাচ্ছি আর বালিশে পিঠ ঠেসান দিয়ে বসে আছি। সব জানলা দরজার শার্শি বন্ধ। মায় পর্দা টানা। তাই ভর বিকেলেই আমার লাল শেড দেওয়া ষ্ট্যাণ্ড আলোটা জ্বালতে হল।

আপনাদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজি ভূতের গল্পে অভ্যস্ত তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, ওদের গল্প লেখার কায়দাই আলাদা। ভূতের গল্প ইংরেজী ভাষায় সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে যায়। লেখা নিয়ে লেখা করা ওদেশের প্রেত কাহিনীকারদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। যেমন ধরুন না প্রথম গল্প, 'দি টারেট্'। ধান ভানতে শিবের গীত নয়। প্রসংগতই লেখক যেভাবে জ্যাকোবিয়ান

স্থাপত্যের সঙ্গে আরো পুরোনো স্থাপত্যের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন তা ভারি ইন্টারেষ্টিং।

যাক্, এখন বিদেশী প্রেতকাহিনীকারদের আন্তরিকতা, পাণ্ডিত্য কিংবা শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে আর কালক্ষয় করব না। 'দি টারেট' পড়বার পর আমার ঝিমুনি এল। আমি তার পরের গল্প 'দিনেরবেলার প্রেতাত্মার' আগের পাতার কোণা মুড়ে রেখে চোখ বন্ধ করলাম।

ঘণ্টা দুই পরে আবার 'দিনেরবেলাব প্রেতাত্মার' মোড়া পাতাটা খুলে দেখি গল্পটির নাম বদল হয়ে গেছে। গল্পটির নাম 'দি ব্রাউন রুম'। এবং তার আগের গল্পটি মোটেই 'দি টারেট' নয় 'দি মুভিং কফিন'! এবং তারপর থেকে ক্রমাগত সাতদিন ধরে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকল। আমি পাগল হয়ে উঠলাম প্রায়। ওই বইই আমাকে পাগল করে দিল। এ বিষয়ে আমার আর কোনো সন্দেহ রইল না যে বইটি শুধু ভূত বিষয়কই নয়। বইটি নিজেও ভৌতিক।

ভৌতিক কেন বলছি?

না, 'ব্রাউন রুমে' আমার অরুচি নেই, কিন্তু আমি কেন 'দিনের-বেলার প্রেতাত্মা'কে খুজে পাবো না? আমার মার্কা পাল্টে যাবে। আসলে আমার পত্র নিরূপণে অসুবিধা হচ্ছিল সূচীপত্র নেই বলে। যাই হোক, সবই তাঁর ইচ্ছা বলে আমি 'ব্রাউন রুম' গল্পটিই পড়লাম। তারপরের গল্পটা 'ঠাণ্ডা হাত' ভালো করে দেখে নিয়ে আবার কোণা মুড়ে চিহ্ন দিয়ে রাখলাম।

এবার আর অত দেরী নয়। আধঘন্টার মধ্যে বই খুলে দেখি ঠাণ্ডা হাতের কোণ মোড়া চিহ্ন উধাও। 'মিশরের মমি' গল্পটির ওপর দেওয়া! আশ্চর্য ব্যাপার। অন্যের ইচ্ছামত গল্প পড়তে যাবো কেন আমি? আমার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা পছন্দ অপছন্দ বলে কি কিছুই নেই? আসলে আমারই কোথাও ভুল হচ্ছে, একথা ভেবে আমি আলমারি খুলে কারুকাজ করা একটা বুকমার্ক বের করে রাখলাম 'শুকনো মড়া' গল্পটার আরম্ভের পাতায়। বই বন্ধ কবে পনের মিনিট রেডিও খুলে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনলাম। কিন্তু স্থির দৃষ্টি রাখলাম বইটার দিকে। গান শেষ হতেই

বই খুলে দেখি, 'শুক্‌নো মড়া' উধাও হয়ে—'মরুভূমির আবছায়া' গল্পটির গায়ে বুকমার্ক টি শোয়ানো আছে।

আমার সমস্ত শরীর রি-রি করতে লাগলো। মনে হল প্রায় ছেড়ে যাওয়া জ্বর, আবার তেড়ে চেপে আসছে আমার ওপরে। বইটি হাতে করে ধরে মনে হল বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিই। শেষ পর্যন্ত ওই জ্বর গায়েই উঠে পড়ে জামা কাপড় পরে ফেললাম। তারপর একটা ট্যাকসি ডেকে রওনা হলাম কলেজ স্ট্রীটে।

কলেজ স্ট্রীটের বুড়োর স্টলটা আমার সবিশেষ চেনা। দেখি বুড়োর ছেলেগুলো সেখানে বসে আছে। ওদের দূর থেকে দেখেই আমার রাগ হল। এই টাট্‌কা রোদে দিনেরবেলায় ওরা আসবে, আর বাবাকে পাঠাবে রাতের অন্ধকারে, ঠাণ্ডায় বেশত। বইখানা ওদের একজনের হাতে তুলে দিয়ে বললাম, বইখানা দিন সাতেক আগে তোমাদের বাবার কাছ থেকে কিনেছিলাম। এখন বেচে দিতে চাই। দশ টাকায় কিনেছিলাম, এখন কতয় নেবে বলো? প্রথমে আমার কথার কোনো উত্তরই দিতে পারল না ছেলেরা। তারপর একজন কোনোরকমে বলল, সাতদিন আগে?

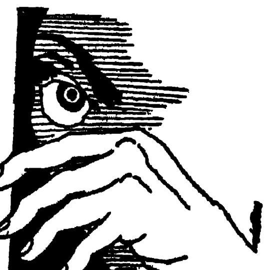
হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই যে, খুব দুর্যোগের দিন, রাতে! আমি অধৈর্য কণ্ঠে বললাম।

ছেলেটি বলল, কয়েন কি, সেদিনইত বাবা মারা গেলেন।

এতক্ষণে আমার চোখে পড়ল বুড়োর ছেলেদের পরনে অশৌচের পোষাক।

কেন?

সুমথনাথ ঘোষ



চাঁদে মানুষ প্রথম পা দিয়েছে বলে সেদিন আমাদের অপিসের ছুটি হয়ে গেল টিফিনের সময়। পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা আর কখনো ঘটেনি। বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রায় সবাই তাই মুগ্ধ, বিস্মিত, হতচকিত।

ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে আলোচনা চলে। সকলের মুখে এককথা! ট্রামে, বাসে, রাস্তায়, ঘাটে, হাটে-বাজারে, রেস্তোরাঁয়—কোথায় নয়? আগের দিন সারারাত জেগে রেডিও খুলে চন্দ্রলোক অভিযানের এই রোমাঞ্চকর ধারাবিবরণী শুনেছে এখানের অনেকে, যেমন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নরনারীরা শুনেছে।

সেদিন বিকেলে লেকের ধারে বসে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দিচ্ছিলুম: আজও পর্যন্ত এমন সংগতি হলো না যে একটা অলওয়েভ রেডিও কিনতে পারি! তাহলে সারা বিশ্বের শ্রোতাদের সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে আমিও কাল রাত্রে বিশ্বলোকের এই হর্ষপুলকিত আনন্দ-উৎসবের অংশীদার হতে পারতুম। কি হতভাগ্য আমার!

হঠাৎ আমার চিন্তাধারায় ছেদ পড়লো। পিছন দিকের বেঞ্চি থেকে কে একজন বলে উঠলেন, দেশের লোকগুলোর কি সব মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি মশাই। কাল সারারাত কি হল্লা! একটু ঘুমতে পারলুম না। আজ আবার ইস্কুল কলেজের ছুটি দিয়েছে, অনেক আপিসের নাকি হাফ-হলিডেও হয়ে গেছে। তারপর কতকগুলো কাগজের স্পেশাল সংখ্যা বেরিয়েছে, দুপুর থেকে তাদের চেঁচামেচির চোটে প্রাণ যায়। না হয় চাঁদে মানুষ গেছে! তাতে কার কি উপকারটা হবে শুনি? বিজ্ঞানের অগ্রগতি না গুষ্টীর পিণ্ডি! যেখানে নিত্য অশান্তি, রোগ-শোক, যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, অশিক্ষা, অনাহার—একটা নয়, অন্তহীন সমস্যা যেখানে, বিজ্ঞানীরা উন্নতি করার কিছু আর খুঁজে না পেয়ে, হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা খরচ করে ছুটলো কিনা চাঁদ থেকে একমুঠো ছাইপাঁশ আনতে!

কে একজন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এই মাটির মানুষ চাঁদে গিয়ে হাঁটছে, এটা কোনদিন চোখে দেখে যাবেন, ভাবতে পেরেছিলেন জীবনে? এর জন্যে আপনার কি থ্রিল হচ্ছে না?

—এর চেয়ে অনেক বেশী থ্রিলিং ঘটনা আমাদের এই দেশে ঘটে, এবং নিত্য ঘটছে, কে তার কতটুকু খবর রাখে! ভদ্রলোকের মুখের ওপর হঠাৎ একটা থাপ্পড় মেরে যেন তাঁকে থামিয়ে দিলেন তিনি।

একটা বেঞ্চিতে ওঁরা পাঁচজন বসে ছিলেন। সবাই বৃদ্ধ এবং অবসরপ্রাপ্ত। আপাততঃ সবাই বেকার। কারুরই কোন কাজকর্ম নেই। তাই কেউ ক্ষিদে করার জন্যে, কেউ বা বাতের কবল থেকে রেহাই পাবার জন্যে সান্ধ্যভ্রমণের পর একটা বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসে রাজনীতি, সমাজনীতি, দুর্নীতি, সবকিছুই আলোচনা করেন। এই সব ভ্রমণসঙ্গীদেরও নিজস্ব এক একটি দল আছে, যাঁরা ভিন্ন বেঞ্চিতে না বসে, গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি করে বসে থাকেন। নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাসমত।

তাই প্রথম বক্তার মুখের কথা থামতেই অপর সকলে একসঙ্গে তাঁর

মুখের ওপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন। তাঁদের সকলের চোখেই বিস্ময়। অর্থাৎ চাঁদে যাওয়ার চেয়ে আরো বেশী থ্রিলিং ঘটনা, সে কিরকম?

প্রথম বক্তা এবার নিজের কথার জের টেনে আনলেন,—এই যে মানুষ, যারা পৃথিবীতে এত সব কাণ্ডকারখানা করছে, তারা যেই মরলো আর সঙ্গে সঙ্গে সব ফুরিয়ে গেল! এসব ফুটুনির কথা অনেক শুনেছি ওদের মুখে, একে কি বিশ্বাস করতে বলেন?

সবাই নীরবে যখন পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছেন তখন তিনি বললেন, শুনলে আপনাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠবে মশাই। এ বানানো গল্পকথা নয়। একেবারে চোখে দেখা। সত্যি ঘটনা।

—ওঃ, ভূত দেখেছেন তাই বলুন! একজন হেসে উঠলেন।

সঙ্গে সঙ্গে বক্তার কণ্ঠ ঝেঁজে ওঠে।—এত সস্তার জিনিস নয় 'ভূত' মশাই যে অবজ্ঞার হাসি হেসে কথাটাকে উড়িয়ে দেবেন। ভূত কি, কেন আসে, কোথায় থাকে, কোথায় যায়—বলুক তো দেখি আপনাদের এই সব চাঁদে হাঁটা বৈজ্ঞানিকরা। সায়েন্সের উন্নতির অনেক বড় বড় কথা তো শুনেছি কিন্তু আজ পর্যন্ত মানুষের জীবনের এতবড় একটা দিক অন্ধকারে ঢাকা পড়েই রয়েছে, অথচ এ নিয়ে কারুর কোন মাথাব্যথা নেই!

আর একজন সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতে একটা শ্লোক ঝাড়লেন, 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনায় কুতঃ!' অর্থাৎ কিনা যে দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, সে আবার ফিরে আসবে কোথা থেকে!

—ও সব বললে শুনছি না। ওসব বোগাস্ গোঁজামিল অনেক শুনেছি। এ একেবারে সত্যি ঘটনা। চোখে দেখা। কেবল আমার নাতি চোখে দেখেনি, আরও অনেকেই দেখেছে। এমন কি আশ্রমের মহারাজ পর্যন্ত দেখেছিলেন। কাজেই ওটা কিছু নয় বলে উড়িয়ে দেবার জিনিস নয়। আপনাদের এই সায়েন্স এখানে ফেলিওর, তাই বলুন।

বলি শুনুন তাহলে ঘটনাটা। বলে ভদ্রলোক শুরু করলেন, আমার নাতি রাজেন্দ্রপুর বিদ্যাশ্রমে ক্লাস সেভেন্-এ পড়ে। দুর্দান্ত ডানপিটে

ছেলে। আর তেমনি সাহসী। ভয়ডর কাকে বলে জানে না। পাড়াগাঁয়ে থাকতো। কোনরকমে তাকে লেখাপড়ায় মন বসাতে না পেরে, শেষে সেখান থেকে এনে বিদ্যাশ্রমের ওই স্কুলে ভর্তি করে দেয় ওর বাবা। বোর্ডিংয়ে মহারাজদের কড়া শাসনে থাকলে যদি পড়াশুনায় মন বসে।

শুধু তাই নয় চরিত্রগঠনের পক্ষেও এ জায়গার তুলনা হয় না। যেমন সুন্দর আবহাওয়া তেমনি মধুর পরিবেশ। ছাত্রাবাসের ঘরগুলি ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন। চতুর্দিকে ফল-ফুলের বাগান। মহারাজরা নিজে তাদের খাওয়াদাওয়া থেকে লেখাপড়া পর্যন্ত সবকিছুর তত্ত্বাবধান করেন।

এক একটি ঘরে চারজন করে ছাত্র থাকে। চারজনের চারটি স্বতন্ত্র খাটিয়ায় বিছানা।

মাস কয়েক পরে আমার নাতিকে দেখতে গিয়ে তার বাবার মনে হয়, ছেলেটা যেন বেশ একটু রোগা হয়ে গেছে। তাই একটা টনিক কিনে দিয়ে বলে আসে, রোজ রাত্রে শুতে যাবার আগে যেন দু'চামচ করে খেয়ে শোয়। কিন্তু হতভাগা ছেলেটা এমনি যে ওই ওষুধটা খাবার কথা একদিনও তার মনে থাকে না। খেয়ে এসেই শুয়ে পড়ে বিছানায়।

এমনি করে কয়েকদিন কেটে যাবার পরে যখন খেয়াল হলো তাকের ওপর থেকে বোতলটা নামিয়ে দেখে, অনেকটা খালি। কে খেলে, এতটা ওষুধ?

ওর যে তিনজন রুম্‌মেট, তাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করলে। তারা তিনজনেই দিব্যি গেলে বললে, মাইরি বলছি, আমরা ওতে হাতও দিইনি। কিছু জানিও না।

নিশ্চয়ই কেউ হাত দিয়েছে, নইলে এতটা ওষুধ কমলো কি করে? তবে কি এ ঘরে অন্য কেউ আসে যখন ওরা থাকে না? ক্লাসে পড়তে যায়, কিংবা মাঠে খেলাধুলা করে? মেট্রনকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে সে।

মেট্রন, ওই আশ্রমেরই প্রবীণ ব্রহ্মচারী। তাঁর অনুমতি ছাড়া কোন লোকের সেখানে ঢোকার হুকুম নেই। তিনি মুচকি হেসে বলেন, এ তোমার বন্ধুবান্ধবদের কীর্তি। তুমি যখন ঘুমিয়ে পড়, তখন তারা এই কাজ করে।

খাবারদাবার কোন ছেলের বাড়ি থেকে পাঠালে অবশ্য কেড়েকুড়ে চুরিচামারি করে বন্ধুবান্ধবরা খেয়ে নেয় এবং সে কার্য সে নিজেও করেছে অনেকবার। তবে ওষুধটা যে কেউ কারো লুকিয়ে খেয়ে নিতে পারে এটা শোনেনি কখনো। এই প্রথম।

যাই হোক, মহারাজ তার মনে ওইরকম একটা সন্দেহ জাগিয়ে দেওয়াতে সে, মনে মনে স্থির করলে, রাত্রে না ঘুমিয়ে বিছানায় ঘুমের ভান করে পড়ে থাকবে। চোরকে হাতেনাতে ধরবেই ধরবে।

গভীর রাত ঝাঁঝাঁ করছে। বিদ্যাশ্রমের উঁচু পাঁচিল ঘেরা ওই বিরাট চৌহদ্দির মধ্যে বোধহয় আর একটা প্রাণীও জেগে নেই। সবাই ঘুমচ্ছে।

ঢং করে দূরে কোন কারখানার পেটাঘড়িতে একটা বাজলো। নিঝুম নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে সেই শব্দটা যখন একটু একটু করে দূর থেকে দূরান্তে মিলিয়ে গেল, আস্তে আস্তে বালিশের ওপর মাথা তুলে, জানালা দিয়ে ঘরে আসা বাইরের অস্পষ্ট আলোতে সে দেখতে পেলে তার বন্ধুরা সবাই ঘুমচ্ছে। গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন। তার চোখের পাতাদুটোও তখন জুড়ে আসছিল। একবার ভাল করে হাত দিয়ে চোখদুটো ঘষে নিয়ে, মাথাটা যেমন নিঃশব্দে বালিশ থেকে তুলেছিল তেমনিভাবেই আস্তে আস্তে আবার রাখলে। শুধু মুখটা এবার ডানদিক থেকে বাঁদিকে ঘুরিয়ে নিলে। ডানদিকের বড় জানালাটার ভেতর দিয়ে কালো কালো গাছের মাথা দেখা যাচ্ছিল।

একটু পরে। রাত তখন বোধহয় খুব বেশী হলে দেড়টা, হঠাৎ তার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠলো। দেখে, একটা আধবুড়ো গোছের লোক, মাথায় টাক, চোখে কালো সেলের চশমা, গলায় একটা কম্ফর্টার জড়ানো, ওষুধের শিশিটা থেকে ওষুধ ঢেলে খেয়ে আবার তাকের ওপর

ঠিক যেখানে শিশিটা যেমন ছিল তুলে রেখে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। চেঁচাতে পারলো না। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইলো সে। মনে হলো কে যেন তার গলাটা চেপে ধরেছে।

পরদিন সকাল হতেই সে মেট্রনের ঘরে গিয়ে বললে, দেখুন একটি বাইরের লোক আমাদের ঘরে ঢুকে রাত্রে চুপিচুপি ওষুধ খেয়ে যায়, আমি কাল দেখেছি।

—সেকি! বাইরের কোন লোকের ত এখানে ঢোকার কোন উপায় নেই। আমাদের গার্ড রয়েছে ফটকে। সারারাত সে পাহারা দেয়। তাছাড়া বাইরে থেকে কোন লোক শুধু তোমার ওই ওষুধ খাবার লোভে রাতের বেলা তোমরা ঘুমিয়ে পড়লে ঘরে ঢুকতে যাবে, এ কি কখনো সম্ভব হতে পারে? তুমি নিশ্চয় ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখেছো।

—না, মহারাজ, আমি স্পষ্ট দেখেছি লোকটাকে!

আচ্ছা, কি রকম দেখতে বল তো?

—টাকমাথা, আধবুড়ো, চোখে কালো সেলের চশমা, গলায় কম্ফর্টার জড়ানো—লোকটা বোধ হয় অসুস্থ, ভাবভঙ্গি দেখে যেন মনে হলো।

সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি মুহূর্ত কয়েক চুপ করে কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, দেখো, এ কথা নিয়ে তুমি তোমার বন্ধুবান্ধব বা অন্য কারুর সঙ্গে আলোচনা করো না। আমি আজ থেকে তোমাদের আট নম্বর ঘরে থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ছ'নম্বর ঘর ছেড়ে ওরা আট নম্বর ঘরে চলে এলো সেদিনই। ছ'নম্বর ঘরটা খালিই পড়ে রইলো।

তারপর থেকে অবশ্য ওদের ঘরে সে লোক আর ঢোকেনি এবং ওষুধও শিশিতে ঠিক যেমনকার তেমনি ছিল।

বোধহয় সাত কি আটটা দিন পরে। একদিন গভীর রাত্রে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল বাথরুমে যাবার জন্যে। সে উঠলো। বাথরুমটা ছিল বারান্দার এক কোণে। সেখানে যেতে হলে ছ'নম্বর ঘরটার সামনে দিয়ে ঘুরে যেতে হয়।

কিন্তু ছ'নম্বর ঘরটার কাছে যাওয়ামাত্র সে চমকে উঠলো। দেখে সেই লোকটা শুয়ে আছে একটা খাটিয়ার ওপর, আর দরজাটা খোলা।

ভয় পেয়ে তখনি উর্ধ্বশ্বাসে সে ছুটে এলো তার ঘরে। বন্ধু তিনজনের গায়ে ধাক্কা দিয়ে তাকে জাগিয়ে বললে, এই শীগগির আয়, সেই লোকটা—

সঙ্গে সঙ্গে তারা ছুটে বেরিয়ে এলো তার সঙ্গে। কিন্তু সেখানে এসে দেখে সব ভোঁভাঁ। কেউ কোথাও নেই। ছ'নম্বরের দরজায় একটা তালা ঝুলছে।

সেদিন ওর বন্ধুরা সবাই মিলে ওকে ভীতু, কাওয়ার্ড বলে গালাগাল দিয়েছিল। কিন্তু আরো ছুটো দিন পরে ওর বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে যে সাহসী, রাতে সে বাথরুমে যেতে গিয়ে চীৎকার করতে করতে ঘরে ছুটে এলো। বললে, মাইরি তোর কথাই সত্যি। ভয়ে তার সারাদেহ তখন রোমাঞ্চিত। গলার স্বর কাঁপছে। বললে, তুই যেমন বলেছিলিস ঠিক হুবহু তেমনি লোকটাকে দেখতে। মাথায় টাক, কালো চশমা চোখে, গলায় কম্ফর্টার জড়ানো, দেখি খাটিয়ার ওপর শুয়ে আছে!

—চল তো দেখি, বলে তখুনি সবাই আবার ছুটে এলো বটে কিন্তু ঠিক আগের দিনের মতই হতাশ হলো। দেখে ছ'নম্বর ঘর তালাবন্ধ। কেউ ত্রিসীমানায় নেই।

পরদিন ওরা মেট্রনের ঘরে গিয়ে বললে, মহারাজ, ছ'নম্বর ঘরে নিশ্চয় ভূত আছে।

—চুপ চুপ! বলে মহারাজ তাদের মুখে হাত চাপা দিলেন। একথা একবার রটে গেলে আর কেউ এ ছাত্রাবাসে থাকতে চাইবে না। তোমাদের এই বিদ্যাশ্রমের বদনাম হয়ে যাবে।

—কিন্তু মহারাজ এর কোন একটা ব্যবস্থা না করলে—

—আচ্ছা, এর একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হবে। তোমরা শুধু মুখ বন্ধ করে রাখ কয়েকটা দিন, কেমন?

এই পর্যন্ত বলে বক্তা এবার একটু থামলেন। তারপর বার দুই কেশে গলাটা সাফ করে নিয়ে বললেন, ঠিক তার পরদিন আমার নাতি ও তার সেই বন্ধু যে দেখেছিল সেই লোকটাকে, দুজনকে সঙ্গে করে মহারাজ হাঁটতে হাঁটতে ওখান থেকে দু'মাইল পথ গিয়ে, একটা প্রকাণ্ড পুরনো আমলের বড়লোকের বাড়ির ফটকে ঢুকলেন। ফটকের একটা মাথা খানিকটা ভাঙা, আর একটা মাথার ওপর একটা সিংহের মূর্তি। সিংহের সামনের একটি পা ভেঙে গেছে, লেজের প্রান্তভাগটাও নেই। ফটক দিয়ে ঢুকলেই সামনে একটা বিরাট বাগান, তাতে আম, কাঁটাল, জাম, জামরুল নানারকমের ফলের গাছ, এবং তারি ভেতর দিয়ে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেই সাবেকী ধরনের চকমেলানো একটা দু'মহল বাড়ি। ইট বার করা, চুন বালি খসে পড়েছে, ছাদের কার্নিসের ওপরে বেশ বড় বটগাছ গজিয়ে উঠেছে। এককালে এটা যে কোন এক ধনীর অট্টালিকা ছিল তার চিহ্ন সর্বত্র বর্তমান।

মহারাজকে সদর দরজার কাছে দেখেই একজন বুড়োমত মালী ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। মহারাজ বললেন, গিন্নীমার সঙ্গে একবার দেখা করবো, একটু খবর দাও। এই গিন্নীমাই বাড়ী সমেত ওই জমিটা বিদ্যাশ্রমকে দান করেছিলেন।

একটু পরেই তিনি তাঁদের ভেতরে ডেকে পাঠালেন।

মহারাজ বললেন, একটু বিশেষ ব্যাপারে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি মা, কিছু মনে করবেন না!

—না না, সেকি! বলুন, কি দরকার! বলে তিনি মহারাজের মুখের দিকে তাকালেন।

—আচ্ছা, আমাদের আশ্রমে ছাত্রাবাস যে বাড়িটায়, সেখানে কি কোনদিন কোন লোকের মৃত্যু হয়েছিল?

—এতদিন পরে একথা কেন প্রশ্ন করছেন, জিজ্ঞেস করতে পারি কি মহারাজ? ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর যেন কেমন করুণ শোনালো।

মহারাজ তখন ছাত্রদুটিকে দেখিয়ে, তারা চাক্ষুষ করেছিল যা যা, একে একে সব তাঁকে নিবেদন করলেন।

ভদ্রমহিলা সব শুনে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, তোমরা একটু আমার সঙ্গে ভেতরে এসো তো বাবা, বলে তাদের নিয়ে তাঁর শয়ন কক্ষে গিয়ে ঢুকলেন। সেখানে একটা দেওয়ালে সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো একটা বিরাট তৈলচিত্র ছিল।

তারা দু'জন ঘরে পা দিয়েই চমকে উঠলো, হ্যাঁ ঠিক এই চেহারা দেখেছি। এমনি মাথায় টাক, এই চশমা, ঠিক এইরকম গলায় কম্‌ফর্টার জড়ানো ছিল।

ভদ্রমহিলা এবার আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বৈঠকখানা ঘরে ফিরে এলেন। তারপর মহারাজকে বললেন, ওরা যাঁকে দেখেছে উনি আমারই স্বামী। ওই বাগান বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়, বিনা চিকিৎসায়। ডাক্তার ওষুধ দিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু আত্মীয় স্বজনরা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে সে ওষুধ খেতে না দিয়ে তাঁকে মেরে ফেলেন তাঁর এই বিপুল বিষয়-সম্পত্তি হস্তগত করার লোভে। কারণ তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। কিন্তু তিনি যে অনেক আগেই আমার নামে সব উইল করে দিয়েছিলেন সে খবর তারা কেউ-ই জানতে পারেনি। তাঁর আত্মা এখনো সেই ওষুধ খাবার জন্যে বোধহয় ঘুরে ঘুরে আসে। আহা, ওষুধ খেলেই ভাল হয়ে উঠবেন, রোগ সেরে যাবে, মনে মনে কত আশা করেছিলেন! বলতে বলতে থেমে গিয়ে আঁচল দিয়ে নিঃশব্দে চোখের জল মুছতে লাগলেন ভদ্রমহিলা। তারপর মহারাজকে বললেন, দেখুন তাঁর, আত্মার যাতে মুক্তি হয় তার জন্যে শান্তিস্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি যা কিছু করা প্রয়োজন এবং যত টাকা খরচ লাগে সব আমি দেবো, আপনারা তার ব্যবস্থা করুন। আমি যাদের হাতে টাকা দিয়ে গয়াতে পাঠিয়েছিলুম ওঁর পিণ্ডদান করতে, তারাও তাহলে ফাঁকি দিয়েছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমার সঙ্গে। নইলে এখনো কেন তাঁর আত্মা এইভাবে ওখানে ঘুরছে!

বক্তা এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গেলেন।

তখন সবাই একসঙ্গে প্রশ্ন করলেন, তারপর কি হলো বলুন।

—সেটাই তো সবচেয়ে বিস্ময়কর। মহারাজরা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত

আনিয়ে শান্তিস্বস্ত্যয়ন যাগযজ্ঞ অনেক কিছু করলেন ঠিক সেই ঘরে। এবং বললে বিশ্বাস করবেন না, তারপর থেকে প্রায় এক বছর কেটে গেছে, কেউ আর কোনদিন ভয় পায়নি, বা সেই মূর্তিকে দেখেনি।

—তাই নাকি? একজন বৃদ্ধ বলে উঠলেন।

তখন ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ বিদ্যাশ্রম তো কাছেই, বেশী দূর নয়। ইচ্ছে করলে একদিন গিয়ে মহারাজকে জিজ্ঞেস করে আসতে পারেন! তিনি সাধুসন্ন্যাসী মানুষ, মিথ্যা বলবেন না কখনই। বলেই কণ্ঠস্বরটা হঠাৎ একটু চড়িয়ে দিয়ে মন্তব্য করলেন, বিজ্ঞানের জয়গানে তো সবাই পঞ্চমুখ, কিন্তু এর কি কোন এক্সপ্লানেশন দিতে পারেন আপনাদের এইসব বৈজ্ঞানিকরা? অথচ মানুষের কাছে এর চেয়ে বড় জিজ্ঞাসা আর কি থাকতে পারে!

এই বলে ভদ্রলোক চুপ করলে, তাঁর সঙ্গীরাও আর ও নিয়ে তর্কে অবতীর্ণ না হয়ে মৌন হয়ে রইলেন। কিন্তু আমার মনের মধ্যে সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল। ভদ্রলোক যা বললেন তা যেমন সত্যি, তেমনি চন্দ্রলোকে মানুষের এই পদার্পণ, এর চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা আজকের তুনিয়ায় আর কি হতে পারে? তাহলে কি বিজ্ঞানের গণ্ডীর বাইরে এই পরলোকতত্ত্ব? তাই বিজ্ঞান আজও এর কোন হদিস করতে পারেনি?

কে জানে!



বিনোদ ডাক্তার

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

আমার চাকরিই এই রকমের। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা ঘুরে বেড়ানো। ব্যাঙ্কের হিসাব দেখে দেখে। কোথাও তিন চার দিনেই কাজ হয়ে যায়, আবার কোথাও দিন কুড়িও লেগে যায়। এটা নির্ভর করে ব্যাঙ্কের হিসাবের জট কেমন পাকিয়েছে তার ওপর।

আগে ব্যাঙ্কের শাখা কেবল বড় বড় শহরেই থাকত। কিন্তু এখন চাষীদের সুবিধার জন্য আধা শহরে, গ্রামেও শাখা হচ্ছে। আমাকে বেশীর ভাগ সময় এই সব আধা শহরেই যেতে হত।

এই ধরণের কাজে একবার বিরামপুরে যেতে হয়েছিল। সকালে অফিসে গিয়ে শুনলাম বেলা তিনটের গাড়ীতে রওনা হতে হবে। আমার এক প্রস্থ বিছানা বাঁধাই থাকত। সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে ট্রেনে চড়ে বসলাম।

বিরামপুর স্টেশনে যখন নামলাম, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। চারদিকে কেরোসিনের আলো জ্বলে উঠেছে। রাস্তায় লোক চলাচল বিশেষ নেই।

ব্যাঙ্ক থেকে একটি লোক আমায় নিতে এসেছিল। আমরা দু'জনে সাইকেল রিক্সায় চড়ে বেশ কিছুটা গিয়ে একতলা লাল রংয়ের বাড়ীর সামনে পৌঁছলাম।

সঙ্গের লোকটি বলল, নামুন স্যর, এখানেই আপনার থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দু'খানা ঘর, মাঝখানে ছোট উঠান, ওপাশে রান্নাঘর। একজনের পক্ষে যথেষ্ট। দরজার কাছে একটি লোক বসেছিল। সে আমাদের দেখে উঠে দাঁড়াল।

ব্যাঙ্কের লোকটি বলল, স্যার, আপনার রান্নাবান্না, বাসন মাজা, ঘর-দোর ঝাড়মোছার কাজ এ-ই করবে।

রাত নটার মধ্যেই খাওয়া শেষ করে শোবার আয়োজন করলাম, কাজের লোকটা চলে গেছে। এখান থেকে তার বাড়ি চার মাইল দূরে। আবার কাল ভোরে ছটায় আসবে।

শোবার মিনিট দশেকের মধ্যে পেটের যন্ত্রনা শুরু হলো। অসহ্য যন্ত্রনা। শরীর একেবারে কুঁকড়ে যায়। মনে হয় দমবন্ধ হয়ে যাবে।

এরকম আমার মাঝে মাঝে হয়, সেইজন্য সব সময় ওষুধ কাছে রাখি।

হ্যারিকেনের শিখাটা বাড়িয়ে দিয়ে স্যুটকেসটা খুললাম। তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। সর্বনাশ। ওষুধের শিশিটা ফেলে এসেছি। বেশ মনে আছে। শিশিতে গোটা আটেক বড়ি ছিল।

এখন উপায়! বিছানায় শুয়ে ছটফট করতে করতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল আসবার সময় কাছেই একটা ডাক্তারখানা চোখে পড়েছিল। ডাক্তারখানার নামটা অদ্ভুত। আরামঘর। তখন ডাক্তারখানা বন্ধ ছিল।

হাতঘড়িতে সময় দেখলাম নটা চল্লিশ। এত রাতে মফঃস্বল শহরে ডাক্তারখানা কি খোলা থাকবে? যাই হোক্, আমাকে একবার চেষ্টা করে দেখতেই হবে। যন্ত্রনা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে।

যদি ডাক্তারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েই থাকে, তাহলে খোঁজ করে দেখতে হবে ডাক্তার হয়তো ওই বাড়িতেই থাকে। দরজা ধাক্কা দিয়ে তাঁকে উঠিয়ে একটা ব্যবস্থা করতে বলতে হবে।

কোন রকমে উঠে দরজায় তালা লাগিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। চারদিক অন্ধকার। রাস্তার বাতিগুলো নিভিয়ে দিয়েছে।

দু'হাতে পেট চেপে প্রায় কুঁজো হয়ে এগিয়ে গেলাম। বরাত ভাল। আরামঘর খোলা। টিমটিমে আলো দেখা যাচ্ছে।

ঢুকতেই দেখা হয়ে গেল। পরনে কালো রংয়ের স্যুট, কালো টাই। ময়লায় তেলটিচে অবস্থা, এক মাথা পাকা চুল। প্রায় কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, তোবড়ানো মুখ, দুটি চোখ রক্তের মত লাল।

কি চাই?

রোগা চেহারা হলে হবে কি, বাজখাই গলার আওয়াজ, পেটের যন্ত্রনার কথা বললাম।

আমার কথা শেষ হবার আগেই ডাক্তার ধমক দিয়ে উঠল, বুঝেছি. বুঝেছি অম্লশুল। বসুন, ওই বেঞ্চটায়।

বসলাম।

ডাক্তার পিছনের কাঁচ ভাঙা আলমারি থেকে একটা শিশি বের করে কাগজে ঢেলে আমাকে দিল, খেয়ে নিন। আমাদের খুড়োর মত কালো রং। বিশ্রী গন্ধ। ভয় হল, কেমন ডাক্তার জানি না, কি ওষুধ ঠিক নেই। খাওয়া কি ঠিক হবে?

সন্দেহ হলে ফেলে দিন। খেতে হবে না।

ডাক্তার গর্জন করে উঠল। টেবিল, বেঞ্চ, আলমারি সেই আওয়াজে থরথর করে কেঁপে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি ওষুধটা গালে ঢেলে দিলাম।

কি আশ্চর্য, মিনিট পাঁচেকও লাগল না। ব্যথাটা একেবারে সেরে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে কত দিতে হবে?

আবার বোমা ফাটল।

কে মশাই আপনি, বিনোদ ডাক্তারকে পয়সা দিতে যাচ্ছেন? কত লাখ টাকার মালিক আপনি? জানেন না, আমি পয়সা নিয়ে চিকিৎসা করি না।

নিজের দোষ কাটবার জন্য মৃদুকণ্ঠে বললাম, কিছু মনে করবেন না। আমি এখানে নতুন এসেছি। এসব জানা ছিল না। আপনার ডাক্তারখানা কতক্ষণ খোলা থাকে?

সারারাত, বলেই বিনোদ ডাক্তার খিঁচিয়ে উঠল, আপনার আর কিছু দরকার আছে? না থাকে তো উঠে পড়ুন। আমার অন্য রোগী আসবে।

বাড়ী চলে এলাম। অনেক রাত অবধি বিনোদ ডাক্তারের কথা চিন্তা করলাম। ভাল ওষুধ হয় তো দেয়, কিন্তু মেজাজটা রুক্ষ। ভালভাবে কথা পর্যন্ত বলতে পারে না।

দিন দুয়েক পর ব্যাঙ্কের হিসাব দেখতে দেখতে ম্যানেজার অনিলবাবুকে কথাটা বললাম।

ছোট জায়গা হলে কি হবে মশাই, এখানকার ডাক্তার একেবারে ধন্বন্তরি।

কার কথা বলছেন?

ওই যে আরামঘর-এর বিনোদ ডাক্তার।

আমার উত্তর শুনে অনিলবাবু কিছুক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে দেখল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, বিনোদ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল কোথায়?

বললাম, দিন দুয়েক আগে, পেটে একটা ব্যথা হয়েছিল। এরকম আমার মাঝে মাঝে হয়। বিনোদ ডাক্তারের একটা বড়িতেই সেরে গেলাম। আশ্চর্য ওষুধ।

অনিলবাবু আর কিছু বলল না, কিন্তু লক্ষ্য করলাম সারাটা দিন আমাকে যেন এড়িয়ে চলল।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। বিনোদ ডাক্তার তার বদমেজাজের জন্য বোধ হয় ও এখানকার কারও প্রিয়পাত্র নয়। এই জন্য অনিলবাবুও সম্ভবতঃ তাকে পছন্দ করে না। তাই আমার বিনোদ ডাক্তারের কাছে যাওয়াটা অনিলবাবু ভাল চোখে দেখে নি।

কিন্তু আমার অবস্থা আমিই জানি। সারাটা রাত সেই নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করে পরের দিন অনিলবাবুর পছন্দসই ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

দিন দুয়েক পর হঠাৎই খেয়াল হল বিনোদ ডাক্তারের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি। খাওয়া দাওয়া শেষ। গরমের জন্য ঘুমও আসছে না। আরামঘর তো অনেক রাত অবধি খোলা থাকে।

দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় জনমানব নেই। এ সময় থাকবারও কথা নয়।

আরামঘর-এর কাছাকাছি যেতেই হাসির শব্দ কানে এল। অনেক লোকের মিলিত কণ্ঠের হাসি। খুব উচ্চরোলে।

তাহলে কি এই সময় বিনোদ ডাক্তারের বন্ধুরা আড্ডা জমায়? আড্ডা দেবার অদ্ভুত সময় তো।

সামনের দিকে কেউ নেই। আওয়াজ আসছে ভেতরের ঘর থেকে। ঘরও ঠিক বলা যায় না। আলমারি দিয়ে একটা ঘরই আলদা করা।

কৌতূহল হল। দুটো আলমারির ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলাম। পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে যেন বরফের স্রোত নেমে গেল। পা দুটো কেঁপে উঠল থরথর করে।

টেবিলের ওপর একটা কঙ্কাল শুয়ে। বিনোদ ডাক্তার স্টেথোসকোপ দিয়ে তার বুক পরীক্ষা করতে বসেছে। মগডালে জলে বেরিও না। তোমার বুকের হাড় খুবই দুর্বল। কোনদিন মট করে ভেঙে যাবে। প্লাষ্টার করে শুইয়ে রাখব, তখন মজাটা টের পাবে।

বিনোদ ডাক্তারের কথা শুনে কঙ্কালটার যে কি হাসি।

ওপরের দিকে চেয়ে দেখি একটা কঙ্কাল শূন্যে দোল খাচ্ছে।

বিনোদ ডাক্তার তার দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বলছে রোজ এই রকম ব্যায়াম করবি, তবে দেহ মজবুত হবে।

হঠাৎ হাসির শব্দে চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, কোণের দিকে বেঞ্চের ওপর বসে আর একটা কঙ্কাল শিশি থেকে বড়ি নিয়ে অনবরত মুখে ফেলছে আর হাসছে। অদ্ভুত হাসি। ঠিক দুটো হাড়ে ঠোকাঠুকি করলে যেমন হয়, তেমন-ই।

কঙ্কালটা হাসতে হাসতেই বলল, বিনোদ ডাক্তর তোমার চোপা চাপকান খুলে আমাদের মতন হালকা হও দেখি। তোমার গরম লাগে না?

কঙ্কালটা আচমকা থেমে গেল, আর কথা বলতে পারল না। বিনোদ ডাক্তার বলল কি হল হে?

কঙ্কালটা অনেক কষ্টে বলল, গলায় বড়ি আটকে গেছে।

বলেই কঙ্কালটা ছুটো হাত দিয়ে নিজের গলাটা মোচড়াল। মাথাটা গলাশুদ্ধ তার হাতে খুলে এল।

সেটা বার কয়েক বেঞ্চে ঠুকেই বলল, ব্যস বড়ি নেমে গেছে।

ব্যাপারটা দেখে আমার অবস্থা কাহিল। ভয়ে গলা থেকে একটা আর্তনাদ বের হয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো কঙ্কাল সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, কে, কে ওখানে?

আমি আর তিলমাত্র দেরী না করে ছুটতে শুরু করলাম। প্রাণপণ শক্তিতে, কোন দিকে না চেয়ে।

পিছনে অনেকগুলো হাড়ের খটমট শব্দ। ক্রমেই কাছে আসছে।

তাড়াতাড়ি তালা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম, বুকটা ঢুপঢুপ করছে। এখনই বুঝি দম বন্ধ হয়ে যাবে।

সারাটা রাত বিছানায় বসে কাটালাম। কেবল মনে হল খটখট শব্দ যেন বাড়ির চারপাশে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। এখনই হয়তো দরজায় কড়া নাড়বে। তারই বা দরকার কি? সরু তো, দরকার হলে বন্ধ দরজার মধ্য দিয়েই চলে আসতে পারে।

আমি খুব ভীতু এমন অপবাদ কেউ দেবে না। ভূত, আত্মা এসবে আমার চিরদিনই আস্থা কম। কিন্তু চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখেছি, তাকে অস্বীকার করি কি করে?

ভোরের দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জোর খটখট শব্দে চমকে জেগে উঠলাম।

না, ভয়ের কিছু নেই। কাজের লোকটা দরজা ঠেলছে।

উঠে দরজা খুলে দিতে সে জিজ্ঞাসা করল, বাবুর কি শরীর খারাপ?

কেন, বল তো?

চেহারাটা কেমন দেখাচ্ছে। তাছাড়া আপনি তো খুব ভোরে উঠেন।

ছোট করে শুধু বললাম, রাত্রে কাল ঘুম হয় নি।

একটা সুবিধা, আজ রবিবার। ছুটির দিন। খাওয়া দাওয়ার পর সারাটা দুপুর ঘুমাব। তাহলেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু আগের রাতে দেখা সেই বীভৎস দৃশ্য চোখের সামনে থেকে তাড়াব কি করে।

বিনোদ ডাক্তারের সম্বন্ধে সব কিছু আমাকে জানাতেই হবে।

কাজের লোকটির নাম যোগেন। যখন দুপুরে যোগেন ভাতের থালা রাখছিল তখন তাকে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা যোগেন, তুমি কতদিন এখানে আছ?

কোথায় বাবু?

এই বিরামপুরে।

মাথা চুলকে যোগেন বলল, তা বিশ বাইশ বছর হবে বাবু। কেন, বলুন তো?

তুমি বিনোদ ডাক্তারকে চেন?

বিনোদ ডাক্তারের নামটা কানে যেতেই যোগেনের মুখের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। চোখের দৃষ্টিতে ভয়ের ছাপ।

চিনতাম বাবু। উনি এ এলাকার নামকরা ডাক্তার ছিলেন। ওঁর ওষুধ যেন কথা বলত।

ছিলেন বলছ কেন? এখন নেই?

না বাবু। বছর পাঁচেক হল মারা গেছেন।

সে কি।

হ্যাঁ বাবু, চার বন্ধু মিলে পাশা খেলছিলেন, হঠাৎ ঝড় উঠেছিল। যেমন হাওয়ার জোর, তেমনই বৃষ্টির দাপট। কত বাড়ীর চাল উড়ে গিয়েছিল, কত গাছ যে উপড়ে পড়েছিল, তার আর ঠিক ঠিকানা নেই।

আরামঘরের পাশে বিরাট একটা বটগাছ ছিল, সেই বটগাছ শিকড় শুদ্ধ উপড়ে পড়েছিল আরামঘরের ছাদের উপর। ব্যাস, বিনোদ ডাক্তার আর তিন বন্ধু খতম। কেউ একটু চেঁচাবারও অবকাশ পান নি। শিকড়ের মধ্যে এমন ভাবে চার বন্ধুর দেহ চাপা পড়ে গিয়েছিল যে, পরের দিন তাদের দেহ কেটে কেটে বের করতে হয়েছিল।

বাধা দিয়ে বললাম, কিন্তু আমি বিনোদ ডাক্তারকে যে দেখেছি।

অনেকেই দেখে বাবু। রাত বিরেতে আরামঘরের পাশ দিয়ে যাদের যেতে হয়, তারাই দেখেছে, বিনোদ ডাক্তার বন্ধুদের ওষুধ দিচ্ছে, কিংবা চারজনে মিলে খেলছে।

তাছাড়া দিনের বেলাতেও দেখা যায়, আরামঘরের সামনের বেলগাছটা, ঝড় নেই, বাতাস নেই, ডালপালাশুদ্ধ দুলছে। ওই গাছেই ওদের বাস কিনা।

কথা শেষ করে যোগেন দুটো হাত কপালে ঠেকাল।

চুপ করে শুনে গেলাম। অন্য সময় হলে যোগেনের একটা কথাও বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু আমি নিজের চোখেই তো সব দেখেছি।

সেদিন বিকাল হতে, সূর্যের আলো থাকতে বের হয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য দিনের আলোয় ভাল করে আরামঘরটা দেখব। যদি সম্ভব হয়, বিনোদ ডাক্তারকে একবার দেখব। ওইখানেই তো ডাক্তারের আস্তানা।

আরাম ঘরের সামনে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

আরামঘরের দরজাই দেখা গেল না। তার সামনে আগাছার জঙ্গল। আকন্দ আর ফণীমনসার ঝোপে বোঝাই। বুঝতেই পারা যায়, বহুদিন এ দরজা খোলা হয় নি, খোলা সম্ভব নয়।

একটু এগিয়ে যেতে তক্ষক ডেকে উঠল। অস্বাভাবিক রুক্ষ স্বর, ঠিক যেন বিনোদ ডাক্তারের গলা।

পিছিয়ে আসতেই চোখে পড়ল।

চারদিক থমথমে। কোথাও ছিটেফোঁটা বাতাস নেই। অথচ সামনের বেলগাছের উঁচু দিকের কয়েকটা ডাল দুলছে। ঠিক মনে হল, বিনোদ ডাক্তারের অশরীরী আত্মা ব্যায়াম করছে নিজেদের দেহের খাঁচা ঠিক রাখার জন্য।

বাড়ী ফিরে এলাম। আরামঘরের কাছাকাছি থাকতে আর সাহস হল না। বিরামপুরেও নয়।

শরীর হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে পড়েছে এখানে থাকা সম্ভব নয়, এই

কথা চিঠিতে লিখে যোগেনকে পরের দিন সকালে চিঠিটা ব্যাঙ্কের ম্যানজারকে দিতে বললাম।

সন্ধ্যার ঝোঁকেই সাইকেল রিক্‌শা ডেকে বিছানা সুটকেস নিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে পড়লাম।

আমার পক্ষে বিরামপুরে থাকা আর সম্ভব নয়। আবার যদি কোন রাতে পেটের যন্ত্রণা শুরু হয়, তাহলে যন্ত্রণায় পাগল হয়ে হয়তো সব ভুলে বিনোদ ডাক্তারের কাছে গিয়ে দাঁড়াব।

কিন্তু তার দেওয়া ওষুধ কি আর খেতে পারব ? সাহস হবে ?



তৃষ্ণা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

প্যাট মেনডোনসা! এই ঘরে তুমি এসেছ আমি বুঝতে পারছি। আমি আর খুঁজব না, বাধা দেব না, আমার ক্ষমতা ফুরিয়েছে—তুমি যা চাও তাই হবে। কিন্তু তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছিনা, তাই ভয় হচ্ছে! তুমি সামনে এসে দাঁড়াও, তোমার কাকে ভয়?

ঘরে যে কটি প্রাণী ছিল সকলে চমকে উঠেছিল। এমন কি অমন নামজাদা ডাক্তারও। রোগের ঘোরে অনেকে অনেক রকম প্রলাপ, বকে, সেটা অসংলগ্ন হয়। জড়তা থাকে। কিন্তু এ যেন কেউ সবরকমভাবে হার মেনে ক্লান্ত বিষন্ন থমথমে গলায় স্পষ্ট করে শেষ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। অনেকের কানে সেটা নিজের মৃত্যুঘোষণার মত লাগল।

অসুখের ঘোরে রোগী আগেও অনেকবার ভুল বকেছে, বিকারগ্রস্ত দুইচোখ টান করে অনেকবার ঘরের চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখেছে। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর এমন স্পষ্ট হয়ে কানে লেগে থাকেনি কারো, সেই চাউনি এত স্পষ্ট, স্বচ্ছ মনে হয়নি। তাতে নিজেকে আগলে রাখার ব্যাকুলতা ছিল, সেই দৃষ্টিতে অব্যক্ত দুর্বোধ্য যাতনা ছিল। অভিজ্ঞ চিকিৎসক ইনজেকশন আর ঘুমের ওষুধ দিয়ে তখন রোগীকে

ঘুম পাড়িয়েছেন। আজ ছ'দিন ধরেই তাই করছেন। দেহগত লক্ষণ তিনি সুবিধের দেখছেন না। অথচ আরো ছুজন সতীর্থ চিকিৎসকের সঙ্গে সলাপরামর্শ করেও সঠিক রোগের হদিস পেয়েছেন বলে মনে হয় না। এক একবার ভেবেছেন হাসপাতালে এনে ফেলা দরকার। আবার মনে হয়েছে এই অবনতির লক্ষণ গোটাগুটি স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ার দরুণ। ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে কোন রোগ যখন দেখা যাচ্ছে না, তখন তেমন ভয়ের কিছু নেই বোধ হয়। স্নায়ু সে-রকম বিকল হলে দেহের অন্যান্য লক্ষণও তার সাথে যুক্ত হতে পারে।

তিনি শুনেছেন রোগীর প্রকৃতি ভাবপ্রবণ। এর উপর বড় রকমের মানসিক বিপর্যয়ের যে কারণ ঘটেছে তাও শুনেছেন। তিনি বিশ্বাস করেননি, সম্ভব অসম্ভবের চিন্তাও তাঁর মাথায় আসেনি। সুস্থ বাসনার একটা বিকৃত প্রকাশ ছাড়া আর কিছু ভাবেননি তিনি। শোনা যায় না। কিন্তু চ্যাটার্জীর মনে হল সে বলছে, প্যাট মেনডোনসা···প্যাট মেনডোনসা— !

ঘরের মধ্যে সব থেকে বেশি অস্বস্তি বোধ করছে চ্যাটার্জী। এই ছু'দিনে অনেকবার যে কথা মনে হয়েছে, কোটটার দিকে চেয়েও আবার সেই কথাই মনে হল। দিয়ে যখন দিয়েই ছিল, এই কোটটা নরিস আর ফিরিয়ে না আনলেই পারত। এই আনাটাই যেন—ভুল হয়েছে। কি ভুল, কেন ভুল চ্যাটার্জিও জানে না। অথচ তার সামনেই তো ওটা ফিরিয়ে এনেছে নরিস, চাটার্জি নির্বাক দাঁড়িয়ে ছিল—অস্বস্তি বোধ করেছিল, কিন্তু বাধা দেবার কথা মনে হয়নি।

ডাক্তার আবার ঔষধ খাওয়ালেন, ইন্‌জেকশন দিলেন।

বাইরে এসে এক বন্ধু ভেবেচিন্তে চ্যাটার্জীকে বলল, দেখো, এক কাজ করো, উৎসবের পরদিন পর্যন্ত তোমারও মাথা খুব সাফছিল না বুঝতে পারছি, তোমাদের কাগজে প্যাটমেন ডোনসার নামে একটা বিজ্ঞাপন দাও—ফিলিপ নরিসের এই অবস্থা জানিয়ে অতি অবশ্য তার সঙ্গে এসে দেখা করতে লেখো—এই বোম্বাই শহরে প্যাট মেন ডোনসা হয়ত তুই বেরুবে, কোথায় কার সঙ্গে লটঘট বাধিয়ে

রেখেছে কে জানে—বিজ্ঞাপন চোখে পড়লে যে আসবার ঠিক এসে হাজির হবে'খন দেখে নিও। তোমরা যে ঠিকানায় গেছিলে সেটা একটা যোগাযোগ হতে পারে আর তার আগের রাত থেকে ফিলিপেরও মাথার গোলযোগ ঘটে থাকতে পারে—সে তো বেসামাল কথাবার্তাই বলছিল তখন, কেউ কি এক বর্ণও বিশ্বাস করেছে !

করেনি সত্যি। চ্যাটার্জী নিজেই করেনি। কিন্তু তারপরে যা সে দেখেছে অবিশ্বাস করবে কি করে। তবু নিজেরই তার বার বার ধাঁধা লাগছে, ধোঁকা লাগছে। ফিলিপের না-হয় মাথার গণ্ডগোল হয়েছিল, কিন্তু তারও কি হয়েছিল ? বন্ধুর কথামত কাগজে বিজ্ঞাপন যে রাতের কথা শুনেছেন সেই রাতে ছোকরা যে প্রকৃতিস্থ ছিল না তাতেও ডাক্তারের কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আজকালকার রোমান্স সর্বস্ব দুর্বলচিত্ত অতি আধুনিক ছেলে-ছোকরাদের জানতে বাকি নেই তাঁর। যে কারণেই হোক বড় রকমের একটা ধাক্কা খেয়েছে, সেটা সামলে ভালো কোন মানসিক চিকিৎসকের হাতে ছেড়ে দিতে পারলেই দায়িত্ব শেষ হতে পারে ভাবছিলেন তিনি।

কিন্তু লক্ষণ দেখে ভিতরে ভিতরে তিনিও শঙ্কা বোধ করছেন এখন।

রোগীর এই শেষ কথা শুনে আর তার এই চাউনি দেখে সব থেকে বেশি চমকে উঠেছিল খবরের কাগজের চ্যাটার্জী। বন্ধুদের মধ্যে আরো দুই একজন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে। চাটার্জীর কাছ থেকেই তারাও ঘটনার কিছু কিছু আভাস জেনে ছিল। আর সাতদিন আগে উৎসবের সেই রাত্রি শেষে একটা মজার প্রহসনে তারা জর্জরিত করেছে নরিসকে, হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলি ? সঙ্গে ঢুকলি না ! তোর মত হাঁদা প্রেমিকে কলা দেখাবে না তো কি, কোটের শোক করতে করতে এখন বাড়ি গিয়ে ঘুমোগে যা –।

ঠাট্টা যারা করছিল, ফিলিপ নরিসের অন্তরঙ্গ বন্ধু খবরের কাগজের চ্যাটার্জিও তাদের একজন।

ফিলিপ নরিসের এই কণ্ঠস্বর শুনে আর এই চাউনি দেখে ঘরের অনেকেই নিজেদের অজ্ঞাতে দরজার দিকে তাকালো। মনে হলো, এই

কথার পর, এই আত্মসমর্পণের পর দ্বার প্রান্তে বুঝি সত্যই কোনো রমণীর নাটকীয় আবির্ভাব ঘটবে। তা ঘটল না। রোগীর দৃষ্টি ধরে চ্যাটার্জীর চোখ যেদিকে ফিরল ঘরের সেখানটায় আল্‌না। আল্‌নার হ্যাঙ্গারে গরম কোট ঝুলছে একটা। ফিলিপ নরিস সেদিকেই চেয়ে আছে, বিকারের চাউনি জানে, কিন্তু বড় অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। যেন সেদিকে চেয়ে সত্যিই কাউকে দেখেছে সে, ঠোঁট ছুটো নড়ছে। বিড় বিড় করে বলছে কিছু। একটা দিয়েই দেখবে? পর মুহূর্তে কি আবার মনে পড়েছে। না ভুল কিছু হয়নি, যারা জানে না তাদের এ-রকম ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু চ্যাটার্জী ভাববে কি করে? এ যদি ভুল হয় তা হলে তার এই মুহূর্তের অস্তিত্বও ঠিক কিনা সন্দেহ।

থাক, এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অবকাশও আর কিছু থাকল না। ডাক্তারের ওষুধ আর ইনজেকশনে—ফিলিপ নরিস চোখ বুজেছে। সেই চোখ মেলে আর তাকায়নি। তার সেই রাতের ঘুম আর ভাঙেনি। কখন শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে নার্সও টের পায়নি। বন্ধুরাও পরদিন এসে তাকে মৃত দেখেছে।

*   *   *   *

এবারে আগের ঘটনাটুকু যোগ করলেও কাহিনী সম্পূর্ণ হবে কিনা বলা শক্ত।

ঘটনাস্থল বোম্বাইয়ের এক মস্ত নামজাদা ইঙ্গভারতীয় ধাঁচের ক্লাব। নামজাদা ক্লাব না বলে নামজাদা সংস্থা বললেই বোধকরি ঠিক হবে। অনিবার্য কারণে নাম অনুক্ত থাক। এই ক্লাব বা ক্লাবের নিজস্ব প্রাসাদ সৌধ সেখানকার সকলেই চেনেন। মেম্বাররা সর্ব ভারতীয় এবং কিছুটা সর্বদেশীয়। তবে একক সংখ্যার বিচারে গোয়ান্ মেয়ে পুরুষের সংখ্যাই বোধ করি বেশী। এই গোয়ান্‌দের মধ্যে আবার জাতের রেষারেষি আছে। গোঁড়া ব্রাহ্মণ-ক্রিশ্চিয়ান গোয়ান্‌দের মাথা উঁচু—সামাজিক ব্যাপারে অধস্তন গোয়ান্‌দের সঙ্গে সচরাচর তারা আপস করে না। কিন্তু এই ক্লাব অনেকটা শ্রীক্ষেত্রের মত। এখানে জাত বর্ণের খোঁজ বড় পড়ে না।

এখানে প্রবেশের প্রধান ছাড়পত্র আর্থিক সংগতি। যার টাকা আছে আর তারুণ্যের পিপাসা আছে তার কাছে ক্লাবের দ্বার অবারিত। বহু লক্ষপতি বা ক্রোড়পতি প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ এই সংস্থার পৃষ্ঠপোষক। নবীন সভ্য-সভ্যাদের টাকার জোরের থেকে দিল্‌-এর জোর বেশি টাকার থেকেও তাদের বড় মূলধন আনন্দ আহরণের উৎসাহ আর উদ্দীপনা—এই উৎসাহ আর উদ্দীপনার ফলেই সাধারণ সংস্থার মুরুব্বীদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে যায়। এখানে ইচ্ছার বেগই প্রধান। এখানে এসে হিসেবের খাতার পাতা খোলে না।

চ্যাটার্জী এখানে ভিড়তে পেরেছে টাকার জোরে নয়, তার কাগজের জোরে। আর কিছুটা তার সুপটু যোগাযোগের ফলে। সুমার্জিত কৌশলে সব-জান্তার আসরে যে নামতে পারে, দুনিয়া উলটে-পালটে গেলেও খুব একটা কিছু যায় আসে না এমনি নির্লিপ্ত মাধুর্যে যে অবকাশ যাপন করতে পারে—এখানে তারই কদর বেশি, সেই হিসেবে চ্যাটার্জী প্রিয়পাত্র এখানকার। ফিলিপ নরিসের বিশেষ গুণ হল সে টাকা যা রোজগার করে তার থেকে বেশী খরচ করতে জানে। নিজের গতি-বিধি আচার-আচরণ সরল, সংযত—অথচ বন্ধুবান্ধব তার বেশির ভাগই বেপরোয়া, সদা মুখর। কারো টাকার দরকার হলে অসঙ্কোচে হাত পাতো ফিলিপ নরিসের কাছে, হাতে থাকলে সে তক্ষুনি দিয়ে দেবে। না থাকলে, আর টাকার প্রয়োজন যার সে প্রিয় পাত্র হলে, ধার করে এনে দেবে। দিয়ে অনুগ্রহ করবে না, নিজেই অনুগৃহীত হবে। ব্যাঙ্কে মোটামুটি ভালই চাকরি করে, ব্যাচিলার, তাই ভাল হোটেলে আলাদা একখানা ঘর নিয়ে থাকার সংগতি আছে।

তাহলে ফিলিপ নরিস ক্লাবের প্রথম সারির কেউ নয়। অর্থাৎ চ্যাটার্জীর মত নিজের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত নয়। সকল সভ্য বা সভ্যারা ভালো করে চেনেও না তাকে। তার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির দরুন সভার আলো উজ্জ্বল বা স্তিমিত হয় না। তারমত সাদামাটা সভ্যসংখ্যা শতকের ওপর। দু'দশজনের কাছে যেটুকু খাতির সে পায় তাও চ্যাটার্জীর সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতার দরুন। এই জন্যই চ্যাটার্জীর প্রতি

সদা কৃতজ্ঞ সে। কৃতজ্ঞতার আরো কারণ আছে, চ্যাটার্জীর সক্রিয় সহযোগীতায় তার কাগজে নরিসের দুই একটা আবেগমুখর প্রবন্ধও ছাপা হয়েছে। তিরিশটাকা দক্ষিণা পেলে আনন্দাতিশয্যে ষাট টাকা খরচ করে বসেছে সে, তবু চ্যাটার্জীর ঋণ শোধ হয়েছে ভাবেনি।

গুণমুগ্ধ দুই একটি ভক্ত সকলেই পছন্দ করে। চ্যাটার্জীরও ভালোলাগে ফিলিপ নরিসকে।

ক্লাবের বার্ষিক উৎসবের রাত সেটা। গোটা প্রাসাদ আলোয় আলোয় একাকার। দু'মাস আগে থেকেই এই একটা রাতের প্রতীক্ষা করে থাকে সকলে। এক রাতের উৎসবে কত হাজার টাকা খরচ হয় সে-প্রসঙ্গ অবান্তর। সভ্য এবং অতিথি-অভ্যাগতদের গাড়ির ভিড়ে প্রাসাদসৌধের সামনের দুটো বড়বড় রাস্তার অনেকটাই আটকে থাকে।

সমস্ত রাতের উৎসব—খাওয়া-দাওয়া নাচগানের ঢালা ব্যবস্থা। যে সময়ের ঘটনা, বোম্বাই শহর তখন 'ড্রাই' নয়, অতএব বহুরকম রঙিন পানীয়ের ব্যবহারেও ত্রুটি ছিল না কিছু। রাত বারটার পরে ডান্স হলে যখন নাচের ডাক পড়ল, নিজের নিজের দুটো পায়ের ওপর তখন অনেকেরই খুব আস্থা নেই।

…সেই মেয়েটির দিকে আবার চোখ পড়ল ফিলিপ নরিসের—এই নিয়ে বার কয়েক চোখ গেল তার দিকে। খুব রূপসী না হলেও সুশ্রী। বছর পঁচিশ ছাব্বিশ হবে বয়স। এই উৎসবে এই বয়সের সঙ্গীহীন মেয়ে বড় দেখা যায় না। ডান্স হলের দরজার ওধারে দেয়াল ঘেঁষে কেমন যেন বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একা। সকলেই যে নাচছে তা নয়, কিন্তু ঐ মেয়েটির মত একা কাউকে মনে হলনা নরিসের। মুখখানা মিষ্টি কিন্তু বড় শুকনো—এক ধরণের বিষন্ন ঘুম-জড়ানো চোখ-মুখ চাউনি। এই পরিবেশ মেয়েটির পরিচিত নয় খুব—মনে হল সেই থেকে সে যেন কাউকে খুঁজছে। অন্যমনস্কের মত নাচ দেখছে এক-একবার আবার শ্রান্ত দৃষ্টিটা এদিক-ওদিক ফিরিয়ে আগন্তুকদের মুখ দেখে নিচ্ছে।

এখানে বিশেষ করে এই সময়ে কারো দিকে কারো চোখ নেই। সকলেই যে যার সঙ্গী-সঙ্গিনী বা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ব্যস্ত। এই রাতের মত রাতে সঙ্গী বা সঙ্গিনী থাকার কথা নয় ফিলিপ নরিসেরও। সে নাচতে একটু আধটু জানে বটে কিন্তু এগিয়ে এসে কাউকে ডেকে নিতে জানে না। সে মদও সচরাচর খায় না, তবে আজ সামান্য খেয়েছে আর তাইতেই বেশ একটু আমেজের মত লাগছে। ভাল লাগছে! একটু আনন্দ করার ইচ্ছে তার মধ্যেও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে! কিছু সহজাত সঙ্কোচে কারোদিকে এগোতেও পারছে না। আর এগোবেই বা কার দিকে, সকলেই ব্যস্ত, আনন্দমগ্ন!

মেয়েটির বিষণ্ণ ঠাণ্ডা দৃষ্টিটা ফিলিপ নরিসের মুখের উপরেও আটকালো দু-একবার। লোকটিও তাকে দেখছে মনে হতেই দৃষ্টিটা চট করে সরে গেলনা মুখ থেকে!

ফিলিপ নরিস উঠে মেয়েটির কাছে এল একসময়। সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি কারো অতিথি এখানে?

সামনে এসে মেয়েটির চোখমুখ আরো নিস্প্রভ। বিষণ্ণ মনে হল নরিসের। কেমন একধরণের আত্মবিস্মৃত জড়তার ভাব। মুখ তুলে তার দিকে তাকাল মেয়েটি। কয়েক মুহূর্ত চেয়েই রইল। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। অস্ফুট শ্রান্ত স্বরে বলল, না……আমি কেমন করে যেন এসে পড়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে ফিলিপ নরিস উদার হয়ে উঠল, বলল, বেশ করেছেন, ইউ আর মোষ্ট ওয়েলকাম মাদাম, দয়া করে নিজেকে আপনি আমার অতিথি ভাবুন। আগে কি খাবেন বলুন? মেয়েটি নিঃশব্দে চেয়েই আছে তেমনি। অথচ নরিসের মনে হল সে যেন কিছু স্মরণ করতে চেষ্টা করছে। বলল, না কিছু খাব না। একটু থেমে আবার বলল, দেখো, আমি সেই থেকে একজনকে খুঁজছি, পাচ্ছি না……ভাবলাম এখানে থাকতেও পারে। তুমি কি বলতে পারবে……

হঠাৎ 'তুমি' শুনে নরিস রীতিমত অবাক। অথচ মেয়েটি যে

খেয়াল না করেই বলেছে তাতেও ভুল নেই ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এখানকার মেম্বার? কি নাম?

নরিস বিস্মিত। কি নাম তাও চট করে মনে করতে পারছেনা স্মরণের চেষ্টা। বেশী মাত্রায় মদটদ খেয়েছে কিনা নরিসের সেই সন্দেহ হল একবার। না, তাহলে টের পেত। মনে পড়েছে। মনে পড়ার দরুণই যেন মেয়েটির শ্রান্ত মুখখানা উজ্জ্বল দেখালো একটু। অস্ফুটস্বরে বলল, ডিসুজা···মার্টিন ডিসুজা···চেনো?

নরিস মাথা নাড়ল, চেনে না।

মেয়েটির বিষণ্ণ মুখখানা বড় অদ্ভুদ লাগছে নরিসের। রাজ্যের অন্যমনস্কতার দরুন সে যেন খুব কাছে নেই। একটা লোকের সন্ধানে এখানে এসে পড়েছে তাও কম আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কোথায় থাকে ডিসুজা, কি করে তাও স্মরণ করতে পারল না। নরিসের কেমন মনে হল, মেয়েটি যে কারণেই হোক বড় অসুখী, তাই খুব প্রকৃতিস্থ নয়। কিছু মানসিক রোগ থাকাও বিচিত্র নয়। যার নাম করছে তার কাছ থেকেই হয়ত বা বড়রকমের কোনো আঘাত পেয়েছে।

নরিস বলল, দেখো এটা আনন্দের হাট, এই আনন্দের টানেই তুমি এসে পড়েছ— বি চিয়ারফুল অ্যাণ্ড হ্যাপি, আমাকে তোমার বন্ধু ভেবে নাও, নাচবে একটু?

ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস ফুটল একটু। ঘুম জড়ানো ভাবটা কাটিয়ে উঠছে যেন। দেখছেই তাকে। এত কি দেখছে নরিস ভেবে পেল না। তার মুখের দিকে চেয়ে যেন বিস্মরণের ধাপগুলো উত্তীর্ণ হতে চেষ্টা করছে।

মাথা নাড়ল। নাচবে।

ডান্স হল। তারা আস্তে আস্তে নাচছে। বাহু স্পর্শ করে নরিসের মনে হয়েছে মেয়েটি বড় দুর্বল, হয়ত অনেকটা পথ পার হয়ে নিজের অগোচরে এখানে চলে এসেছে। সহৃদয় সুরে বলল, আগে কিছু খেয়ে নাও না, এই উৎসব সমস্ত রাত ধরে চলবে।

তার চোখের আত্মবিস্মৃত দৃষ্টি এখন আরো একটু বদলেছে। নাচের

ফাঁকে নরিসের মুখখানাই দেখছে ঘুরে ফিরে, এই চোখ ঈষৎ প্রসন্ন। মেয়েটির তাকে পছন্দ হয়েছে বোঝা যায়। মাথা নেড়ে জানালো খাবার ইচ্ছে নেই। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি ?

নরিস···ফিলিপ নরিস। তোমার ?

প্যাট মেনডোনসা।···তুমি খুব ভালো···ডিসুজার মতই দরদী··· তুমি কি ব্রাহ্মিণ, ক্রিশ্চিয়ান ?

নরিস হঠাৎ এ প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝল না।—না, কেন বলো তো ?

নয় শুনে প্যাট মেনডোনসার চোখে মুখে খুশির আভাস। জবাব না দিয়ে চুপ করে রইল। একটু বাদে বলল, আমার কেমন শীত শীত করছে।

নরিস কি করতে পারে! আধঘণ্টার আলাপে মেয়েটির প্রতি মায়া অনুভব করছে কেন জানে না। আর কোনো মেয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কখনো আসেনি বলেও হতে পারে। এ যেন এরই মধ্যে তাঁর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। আর একটু কাছে টেনে আনল নাচের গতি বাড়িয়ে দিল। সঙ্গী এত সদয় বলেই যেন প্যাটমেনডোনসা কৃতজ্ঞ, সে কাছে ঘেঁসে এসেছে, মন্থর পায়ে নাচছে, আর প্রসন্ন চোখে দেখছে তাকে।

বিশ্রামের জন্য দু'জনে একটা নিরিবিলি কোণে গিয়ে বসল একটু। আর তখনি প্যাট মেনডোনসা অস্ফুট ক্লান্ত স্বরে বলল, আমার ভয়ানক শীত করছে। আমি আর থাকতে পারছি না······

জামার ওপর তার কাঁধে হাত রেখে নরিস বিচলিত হল একটু। গা'টা সত্যি বড় বেশী ঠাণ্ডা। আবার আগের মতই শ্রান্ত আর ক্লান্ত মনে হল তাকে। তাড়াতাড়ি উঠে নরিস নিজের দামী গরম কোটটা নিয়ে এসে তার গায়ে পরিয়ে দিল। বলল, তোমাকে খুব সুস্থ লাগছে না, আর রাত না করে তুমি একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ি চলে যাও, বাড়ি কোথায় ?

বান্দ্রা।

বেশী দূরে নয় তা হলে। প্যাট মেনডোনসার গায়ে তার নিজের

কোটের পকেট হাতড়ে এক টুকরো কাগজ আর কলম বার করল। পলকে কি ভেবে সে দুটো তার দিকেই বাড়িয়ে দিল।—তোমার বাড়ির ঠিকানা লিখে দাও, কাল সকালে গিয়ে আমি কোটটা নিয়ে আসব'খন।

এ-রকম বিদায়টা যেন খুব পছন্দ নয় মেয়েটির, মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে নাম, বাড়ির নম্বর আর ঠিকানা লিখে দিল। কাগজটা নিজের পকেটে রেখে নরিস বলল, চলো তোমাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আসি।

দোতলার সিঁড়ির কাছে আসার আগেই সামনের লম্বা প্যাসেজের দিকে চোখে পড়তে মেনডোনসা দাঁড়াল।—ও-দিকটা কি ?

বাথ······

অস্ফুট স্বরে বলল, আমি যাব, দেখিয়ে দাও—

প্যাসেজ ধরে পায়ে পায়ে খানিকটা এগিয়ে নরিস দাঁড়াল। প্যাট মেনডোনসা হালফ্যাশানের মস্ত বাথরুমের দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, গম্ভীর ক্লান্ত দুটো চোখ আবার নরিসের মুখে এসে আটকালো। মাথা নেড়ে ডাকল তাকে।

ঈষৎ বিস্মিত মুখে সে কাছে আসতে বলল, তুমিও এসো।

হঠাৎ হতভম্ব বিমূঢ় নরিস। বলে কি! এ কার পাল্লায় পড়ল সে! তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠল, নানা, কিছু ভয় নেই, তুমি যাও, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি।

রমণীর নিষ্পলক দুই চোখে তার মুখের থেকে নড়ছে না। এই মুখে আর চোখে একটা কঠিন ছায়া পড়ছে। শান্ত ঠাণ্ডা গলায় আবার বলল, তুমিও এসো।

প্রায় আদেশের মত শোনালো। নরিস ঘাবড়েই গেল। কপালে ঘাম দেখা দিল। এ কি সাঙ্ঘাতিক মেয়ে। ভয় নেই, সঙ্কোচ নেই—নাকি এও মানসিক রোগ কিছু! বিস্ময় সংবরণ করে এবারে জোর করেই মাথা ঝাঁকল নরিস, বলল, আঃ! কেউ এসে পড়লে কি ভাববে! বলছি তুমি যাও, আমি এখানে দাড়াচ্ছি—

প্যাট মেনডোনসা চেয়েই আছে। চেয়েই আছে। তারপর আস্তে

আস্তে বাথরুমের দরজা খুলল সে। ভিতরে ঢুকল। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল নরিসের।..... ভালয় ভালয় এখন ট্যাক্সিতে উঠলে হয়।

জানালায় ঠেস দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো সে। অদ্ভুত মেয়েটার কথাই ভাবছে।

হঠাৎ সচকিত। একটা আস্ত সিগারেট শেষ হয়ে গেল, আর একটা কখন ধরিয়েছে এবং আধাআধি শেষ করেছে খেয়াল নেই—অথচ প্যাট মেনডোনসা এখনো বেরোয়নি। বাথরুমের দরজা বন্ধ।

দ্বিতীয় সিগারেট শেষ হল। নরিস পায়চারি করছে। কিন্তু দরজা খোলার নাম নেই।

তারপর আরো আধঘন্টা কেটে গেল। নরিস বিলক্ষণ ঘাবড়েছে। দরজা ঠেলেছে, দরজায়মৃদু আঘাত করেছে, ডেকেছে—কিন্তু ভিতর থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। তারপর একটা করে মিনিট গেছে আর আর নরিসের ভয় বেড়েছে। গোড়া থেকেই কেমন লাগছিল মেয়েটাকে—ভিতরে অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে গেল, না কি কোনো অঘটন ঘটিয়ে বসল!

ঘড়ি দেখল! সাড়ে তিনটে বেজে গেছে রাত্রি। তার মানে একঘন্টার ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে প্যাসেজে! বিমূঢ় নরিস কি করবে দিশা পেল না। জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিল কয়েকবার। মজবুত দরজা একটু কাঁপল শুধু।

নরিস দৌড়লো হঠাৎ। আধভাঙা আসর থেকে চ্যাটার্জীকে খুঁজে বার করল। চ্যাটার্জী প্রকৃতিস্থই আছে বটে, কিন্তু নিজের হাত পায়ের ওপর দখল খুব নেই। তাকে একরকম টানতে টানতেই নিয়ে এলো নরিস। চ্যাটার্জী পিছু পিছু আর দুই একজন উৎসুক বন্ধুও এলো। খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটা শুনে তারও অবাক। খানিকক্ষণ দরজা ধাক্কাধাক্কি করল তারও।

শেষে কেয়ারটেকারের তলব পড়ল। বেগতিক দেখে কেয়ারটেকার পুলিশে ফোন করল। পুলিশ এসে দরজা ভাঙল যখন, তখন প্রায় সকাল।

ভিতরে কেউ নেই।

এক সঙ্গে বহু জোড়া বিস্মিত দৃষ্টির ঘায়ে নরিস বিভ্রান্ত, বিমূঢ়। বাহ্যচেতনা লোপ পাবার উপক্রম তার।

সুরার ঝোঁকে দুই একজন ঠাট্টা করল, নরিসের প্রেয়সী বাথরুমের জানালা দিয়ে নিশ্চয় পাখী হয়ে উড়ে পালিয়ে গেছে। নইলে ভিতর থেকে উধাও হবার আর কোন পথ নেই।

কেয়ারটেকার বা পুলিসের লোকেরও ধারনা হল, নরিস বেসামাল হয়েছিল হয়ত, ভিতরে যে ঢুকেছিল সে কখন বেরিয়ে চলে গেছে খেয়াল করেনি—আর বাইরে থেকে দরজার হ্যাণ্ডেল টানাহেঁচড়ার ফলে হোক বা অন্যকোন অস্বাভাবিক কারণে হোক ভীতরের ল্যাচ আটকে গেছে। বাইরে থেকে টানাহেঁচড়া করে বা কোনরকম অস্বভাবিক কারণে এই দরজার ল্যাচ আটকে যেতে পারে কিনা—এই দিনের এই সময়ে তা নিয়ে গবেষণা করার মত ধৈর্য কারো নেই।

চ্যাটার্জী হতভম্ব নরিসকে একদিকে টেনে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, রাত্তিরে কতটা খেয়েছিলে?

নরিস সত্যি কথাই বলল, কিন্তু, চ্যাটার্জীর সংশয় গেল না।

বলল, অভ্যেস নেই—এটুকুতেই গণ্ডগোল হয়েছে।

তাকে বিশ্বাস করানোর ঝোঁকে পকেট থেকে চিরকুট বার করল নরিস, এই দ্যাখো, আমার কোট গায়ে দিয়ে গেছে, নিজের হাতে নাম বাড়ির ঠিকানা লিখে দিয়েছে—

চ্যাটার্জী দেখল। রাতের ধকলে তার মাথাও খুব পরিস্কার নয়। তবু একমাত্র সংগত মন্তব্যই করল সে: বলল, তাহলে তুমি যখন জানালার দিকে ফিরে সিগারেট খাচ্ছিলে তখনই বেরিয়ে চলে গেছে সে, তুমি টের পাওনি। নিশ্চয় তোমার মতলব ভালো মনে হয়নি তার তাই—

নরিস তখন আদ্যোপান্ত ব্যাপারটাই বলল তাকে। মতলব যে কার ভালো ছিল না তাও গোপন করল না। শুনে চ্যাটার্জী হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে - বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পেল না।

এদিকে চ্যাটার্জীর ওই শেষের যুক্তিই সম্ভবপর মনে হয়েছে নরিসের।

সে যখন জানালার দিকে ফিরে সিগারেট টানতে টানতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, মেয়েটা তার অলক্ষ্যে তখনই চলে গিয়ে থাকবে। এছাড়া কি আর হতে পারে! তার অনভ্যস্ত জঠরে ওই সামান্য সুরাই হয়তো কিছুটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তাকে। আর, মেয়েটা যে রুষ্ট হয়েছিল সে তো বোঝাই গেছে—তাই কোন রকম বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই চলে গেছে।

ঘণ্টা তিনেক নরিসের ঘরেই ঘুমালো চ্যাটার্জী, তারপর নরিস ঠেলে তুলল তাকে। তাকে নিয়ে সে প্যাট মেনডোনসার বাড়ি যাবে কোট আনতে।

ঘুম তাড়িয়ে নরিসের সঙ্গ নিল চ্যাটার্জী। যে মেয়ে ওভাবে নিজেকে এগিয়ে দিতে চেয়েছিল, তাকে একবার দেখার কৌতূহলও ছিল। চিরকুটের নম্বর মিলিয়ে বান্দ্রার বাড়ির ঠিকানায় এসে দাঁড়াল তারা। কড়া নাড়তে এক বৃদ্ধ দরজা খুলে দিলেন।

নরিস প্যাট মেনডোনসার খোঁজ করতে বৃদ্ধটি খানিক চেয়ে রইলেন মুখের দিকে। তারপর জিজ্ঞাসা করল, আপনারা কে?

নরিস জানালো তারা কে এবং কেন এসেছে। গতরাতের ফাংশানে শীত করছিল বলে প্যাট মেনডোনসা তার কোট গায়ে দিয়ে বাড়ি ফিরেছে, সেই কোটটা ফেরত নিতে এসেছে তারা। নাম ঠিকানা লেখা চিরকুটটা তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিল নরিস।

বৃদ্ধ দেখলেন। গম্ভীর। বললেন, আচ্ছা, আপনারা বসুন একটু—

ভিতরে চলে গেলেন তিনি। একটু বাদে বাঁধানো একটা ফোটো হাতে ফিরলেন। সেটা এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখুন তো এর মধ্যে কেউ কাল আপনার কোট নিয়ে এসেছিল কি না।

বৃদ্ধের ব্যবহারে এরা দুজনেই মনে মনে বিস্মিত। সামনে আট দশটি নারী পুরুষের বড় গ্রুপ ফোটো একটা। সেটার দিকে একনজর তাকিয়ে আঙুল দিয়ে প্যাট মেনডোনসাকে দেখিয়ে দিল নরিস। বলল, ইনি—

দু'চোখ টান করে বৃদ্ধ নরিসের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। নরিস জিজ্ঞাসা করল, ইনি কি এ বাড়িতে থাকেন না?

থাকত। এখন থাকে না। আমার এই মেয়ে দুবছর আগে মোটর অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেছে।

নরিস আর তার সঙ্গে চ্যাটার্জীও কি সত্যি শুনছে, নাকি এখনো রাতের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে! সত্যিই কোথায় তারা?

চেতনারহিতের মত আরো একটু খবর শুনল। বৃদ্ধ জানালেন, বাড়ির সবথেকে সেরা মেয়ে ছিল এই প্যাট মেনডোনসা—মার্টিন ডিসুজা নামে এক ছেলেকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল। সকলে ধরেও নিয়েছিল বিয়ে হবে। কিন্তু ডিসুজার বাপ মা'র বড় গর্ব তারা ব্রাহ্মিণ, ক্রিশ্চিয়ান—বিয়ে হতে দিলনা। বিয়ে হবে না শুনে মেয়েটার মাথাই বিগড়ে গিয়েছিল, নিজে গাড়ী চালিয়ে ফিরছিল ডিসুজার বাড়ি থেকে—দাদারে সাংঘাতিক অ্যাকসিডেণ্ট হোল—তক্ষুণি শেষ! অ্যাকসিডেণ্টের খবরটা কাগজে বেরিয়েছিল।

অনেকক্ষণ রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কাটাল নরিস। চ্যাটার্জী ঠেলে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারল না। মুখে কথা নেই। কেমন যেন হয়ে গেছে। খানিক বাদে ফুল কিনল একগোছা, চ্যাটার্জীকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল।

সমাধি-ক্ষেত্র। নিঃশব্দে খুঁজতে খুঁজতে এগোচ্ছে দুজনে। বেশী খুজতে হলনা। হঠাৎ একদিকে চোখ পড়তে নিস্পন্দ কাঠ দুজনেই; ওই ছোট সমাধি একটা। সমাধির ওপর ক্রস্। ক্রস্-এ ঝুলছে নরিসের সেই কোট। সমাধির গায়ে নামের হরপ—প্যাট মেনডোনসা।

নির্বাক স্তব্ধ দুজনেই। অভিভূতের মত কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সমাধির সামনে হুঁশ নেই।

নরিস ফুল দিল। ক্রস্-এর উপর থেকে কোটটা হাতে তুলে নিল। বলল, চলো—

ফিলিপ নরিসের হাতে কোটটা দেখে কি এক অজ্ঞাত অস্বস্তি বোধ করছিল চ্যাটার্জী। কিন্তু বলা হয়নি, ওটা থাক্।

---

* আখ্যানের বক্তা খবরের কাগজের চ্যাটার্জী আমার বন্ধু। মূল ঘটনাটি সত্যি বলে তাঁর দাবি।